প্রকাশক :
শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রকাশ : অগ্রহায়ণ,
১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনিত্যানন্দ পাত্র
ভারতী প্রেস
১৪নং হরিপদ দত্ত লেন
কলিকাতা—৬

পরমারাধ্য গুরুদেব

শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহামণ্ডলেশ্বর
মহারাজের স্মরণে

"শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর,
আর পরহিতায় জীবনপাত কর—
এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ"

—বিবেকানন্দ

# — নিবেদন —

বাংলার নাট্যসাহিত্য-ভাণ্ডার অফুরন্ত। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক ও কাল্পনিক বহু চমকপ্রদ নাটকের অভাব নেই। কিন্তু মহাপুরুষ জীবনী বা জীবননাট্য রচনায় স্থান নেই কল্পনার—প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ সেই প্রচেষ্টা দৃঢ় সত্যের ভিত্তির উপর। তাই শুধু লেখনীর প্রতিভা মুখেই সফল হতে পারে না এই প্রচেষ্টা, যদি না থাকে তার পিছনে নিষ্ঠা ও প্রাণের টান, আর সেই টানে নেমে আসে সেই মহাপুরুষের কৃপা! আমার এই প্রচেষ্টা যদি কিছুমাত্র আনন্দ পরিবেশনে সক্ষম হয়ে থাকে, তবে সেটা বিশ্বের আলো স্বামী বিবেকানন্দেরই করুণায়; আর ত্রুটি বিচ্যুত যদি বা যতটুকু থাকে—সেটা আমারই অক্ষমতার পরিচয়! বিবেকানন্দ শততম জয়ন্তী উৎসবে শ্রীগুরু সংস্কৃতি ( নাট্য ) সঙ্ঘ ( এস, ই, রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ ) পরম সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বরূপা মঞ্চে আমার এই প্রচেষ্টার রূপ দিয়ে আমায় বাধিত করেছেন—তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার নিয়ে বেলুড় মঠের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীমণ্ডলীর উপস্থিতিতে পূজাপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের প্রধান আতিথ্যে সম্পাদিত হয় এই অনুষ্ঠান। নাটকখানি দর্শক-মণ্ডলী, বিশেষ করে, এই সন্ন্যাসীমণ্ডলীর বিশেষ তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হয়েছে জেনে কৃতার্থ হয়েছি। এই সঙ্গে জানাই আর একটি কথা! আবাহন গীতটি লিখে দিয়ে সাহিত্যিক-কবি বন্ধুবর শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন আমায়—তাঁকেও জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। অপর গানগুলির একটি ভক্তকবি সুরদাস রচিত—অন্যগুলি কথামৃত থেকে গৃহীত। এই নাটক রচনায় পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ রচিত লীলাপ্রসঙ্গ, ৺প্রমথনাথ বসুর স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীযুত গৌর গোপাল বিদ্যাবিনোদ রচিত স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু সহায়তা লওয়ার জন্য ঋণ স্বীকার করছি। সবশেষে এই নাটকের বহুল প্রচার ও সাফল্যের প্রার্থনা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের চরণে জানাই আমার ভক্তিভরা প্রণতি।

অভিযাত্রী

# পরিচয়

রামকৃষ্ণ

বিবেকানন্দ

বিশ্বনাথ দত্ত— বিবেকানন্দেব পিতা

বিলে<br>নরেন্দ্রনাথ } —বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম

কেশব সেন—ব্রাহ্ম ধর্মাচার্য

রাখাল, বাবুরাম, লাটু<br>কালী, গিরীশ ঘোষ,<br>গোপাল } —বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতাগণ

সাধক।

ললিত<br>বিজয় }—নরেনের বন্ধু

আলোয়ারের মহারাজ

রামচন্দ্রজি —আলোয়ারের দেওয়ান

মৌলবী —স্থানীয় হাই স্কুলের একজন ধর্মপ্রাণ শিক্ষক ও রাজার বন্ধু।

খেতরীর মহারাজ

নবীন —বিশ্বনাথ দত্তের বাড়ীর চাকর।

ভাঙ্গী, বেনে, হালুইকর, ফেরিওয়ালা, চামার।

ভুবনেশ্বরী—বিবেকানন্দের মাতা

রমলা—বারবণিতা

অলকা—বাঈজী (খেতরীরাজের)

মিস্ মার্গারেট নোবেল—

স্বামীজীর ইংরাজ শিষ্যা (পরে নিবেদিতা নামে পরিচিতা)

# স্বামী বিবেকানন্দ

## আভাস

রাত্রি এক প্রহর। নির্মল আকাশের বুক। দপ্ দপ্ করে জ্বলছে সপ্তর্ষি মণ্ডল। দূর থেকে ভেসে আসছে বেদমন্ত্র। খসে পড়ে একটি তারা। আকাশের বুক বেয়ে নেমে আসে ধরার বুকে।

ভেসে ওঠে আকুল আহ্বান—আয়, আয়—আয়—!

সরে যায় আকাশের দৃশ্য। জেগে ওঠে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির সংলগ্ন ঘাট। একপাশে বসে এক সাধক। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবোন্মাদ গদাই ঠাকুর।

**গদাই।** আয়, আয়, আয়—ওরে ছুটে আয়! ছুটে আয়! (উর্ধ্বে আঙুল তুলিয়া) ওই, ওই, ওই আসে—ওই আসে! আয়, আয়, ছুটে আয়। কেন, কেন এত দেরী? আমি যে কতকাল আগে তোকে ডেকে এসেছি! এলো, এলো—ওই এলো! ওরে দুলাল, তোর হাসিতে ফুটবে ফুল, তোর পরশে সাজবে ধরা! ওরে নবীন, আমার বীণার তুই যে হবি সুর, আমার পূজার তুই যে হবি শঙ্খ—আমার ভাবের তুই যে দিবি ভাষা! আমি যে কুসুম, তুই যে সুরভি! আমি যে প্রদীপ, তুই যে শিখা! তুই তো বিলাবি আমার সব সাধনার ফল। মা, মাগো সে এসেছে—সে এসেছে।

ভাবোন্মাদনায় নাচিতে নাচিতে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে বাজিয়া ওঠে শঙ্খ ঘণ্টা। ক্রমে লীন হয়ে আসে ঘণ্টাধ্বনি— ভেসে ওঠে আবাহন গীতি। গাহিয়া চলে সাধক—

## গীত

আঁধারের বুকে নেমে আসে ওই
একটি আলোর রেখা
নবোদয় ক্ষণ, আসিছে লগন
কিবা রূপে দেবে দেখা।
আসে আলো, আসে আলো॥
নিশা অবসানে জাগিবে ধরণী
নব প্রাণে বিভা আলোক প্লাবনী
ঘুচিবে আঁধার তিমির নাশিনী
ফুটিবে অরুণ লেখা।
আসে আলো, আসে আলো॥
টুটিবে আঁধার সুপ্তি রাতের কালো
সে যে আলো, সে যে আলো!
নির্মল জ্যোতি ভরে যে ভুবন
একী আনন্দ এ মহা লগন,
নব জনমের অমৃত ক্ষরণ
টুটিবে আঁধার রেখা।
আসে আলো, আসে আলো॥

# উন্মেষ

## প্রথম দৃশ্য

### শিমুলিয়ার দত্ত বাড়ী

দোতলার দরদালান। ভুবনেশ্বরীর চুলের গোছা দুই হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে বিলের প্রবেশ। চুল ছাড়াইবার চেষ্টা করেন ভুবনেশ্বরী।

ভুবন। ওরে হতভাগা ডাকাত, ছাড়, ছাড, ছেড়ে দে। উঃ মাগো, চুল যে আমার ছিঁড়ে গেল!

বিলে। না, ছাড়বো না। কিছুতেই ছাডবো না!

ভুবন। দাঁড়া, তোকে আজ মেরেই ফেলবো।

(ঝাপটা-ঝাপটি করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

বিলে। ছেড়ে দাও মা, আর কখনও এমন করবো না!

ভুবন। ছেড়ে দেবো? থাক এই ঘরে সারাদিন বন্দী হয়ে! এই কে আছিস? দেখিস, যেন কেউ এই ঘরের দরজা খুলে না দেয়।

(ভুবনের পুনঃ প্রবেশ)

ওঃ, কি দস্যি ছেলে! আমাকে একেবারে হিম্‌শিম্‌ খাইয়ে দিয়েছে। সারাদিন ওর উৎপাতে বাড়ীশুদ্ধ লোক পাগল হয়ে গেল! ওকে নিয়ে যে আমি কি করবো ভেবে পাইনে!

(নীরবে পিছন দিক হইতে বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্বনাথ। (মৃদু হাসিয়া) ~~ওঃ~~ বাবা! মেজাজটা যেন বড়ই গরম মনে হচ্ছে!

ভুবন। (ঝামটা মারিয়া) গরম হবে না? এক'শ বার হবে!

বিশ্বনাথ। তা, তা আমি তো কোন অপরাধ করিনি?

ভুবন। করোনি? তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া!

বিশ্বনাথ। (হাসি গোপন করার চেষ্টা করিয়া) তা, গোড়ার কারণ আবিষ্কার তো হলো! কিন্তু ডগার ঘটনাটা তো কিছুই বোঝা গেল না এখনও?

ভুবন। বোঝাবুঝির আছে কি? বাপকে নিয়ে জ্বলেছি এতকাল—এখন জ্বলছি ছেলেকে নিয়ে! যেমন বাপ, তেমনি হয়েছে তার ছেলে।

বিশ্বনাথ। মায়েদের কাছে বাপেদের এই চিরন্তন অপবাদ মোচনের কোন পথই যখন কেউ খুঁজে পায়নি কোনদিন—তখন আমার পক্ষে সে চেষ্টা বৃথা। কিন্তু ছেলে আবার করলো কি?

ভুবন। করলো কি, তার হিসাব আছে? কি না করছে সে?

বিশ্বনাথ। কোথায় গেল সে?

ভুবন। রেখেছি সেই দস্যিকে ওই ঘরে বন্ধ করে। ওর জ্বালায় পাগল হয়ে গেলাম আমি।

বিশ্বনাথ। (মৃদু হাসিয়া) অদ্ভুত তোমাদের মায়ের প্রাণ। যখন পাওনি ওকে—এত থাকতেও তুমি হয়েছিলে পাগল! আবার পেয়েও একটুতেই এখন হচ্ছো পাগল!

ভুবন। (মৃদু হাসিয়া) হচ্ছি বেশ করছি। তুমি পুরুষ, মুক্ত আকাশের স্বাধীন বিহঙ্গ! বুঝতে পারবে না নীড়গত প্রাণ পক্ষিনীর মনের কথা!

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) তা হলে এই দুমুখো রোগের ওষুধটা এখন কি?

ভুবন। (হাসিয়া) ওষুধ? ওই দস্যিই তো আমার সব রোগের মহাওষুধ! ও আমার ইষ্ট দেবতা বীরেশ্বর শিবের করুণার দান। ওকে পেয়েই তো সব জ্বালা জুড়িয়েছে আমার!

বিশ্বনাথ। (কপট অভিমানে) তবে আর অকারণ আমার ওই অপবাদটা—

ভুবন। (কপট রোষে) অকারণ? তুমি কি কম জ্বালিয়েছো আমায়?

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) বিশ্বনাথ মহাদেব তো আপন অনাচারে চিরকালই জ্বালিয়েছেন ভুবনেশ্বরীকে!

ভুবন। (উজ্জ্বল মুখে গদগদ স্বরে) আবার তাঁকেই জন্মে জন্মে পেতে ভুবনেশ্বরী নব নব রূপে করেছে কঠোর তপস্যা। জীবনের যা কিছু আমার সুখের, সবই এই শিবঠাকুরের দান!

(নত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম)

বিশ্বনাথ। দরজাটা এবার খোলো, ওটাকে একটু দেখে যাই!

ভুবন। না। ছেলের দুঃখে, একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে বাপের প্রাণটা—না?

বিশ্বনাথ। সেটা যে স্বাভাবিক ভুবন! অতি শৈশবে আমায় সংসার-মরুতে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন আমার বাবা। পিতৃস্নেহ কি তা আশৈশব জানি না আমি! পুত্রস্নেহ দিয়েই তাই পূরণ করতে চাই আমার সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা!

ভুবন। (কাতর স্বরে) ওগো, অমন করে বলো না আর! এখুনি আমি খুলে দিচ্ছি দরজা।

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) না! মায়ের শাসনের উপর কর্তৃত্ব করলে, বাপের শাসনও মানে না সন্তান।

(হাসিমুখে প্রস্থান)

ভুবন। আমার বিলে! আমার ইষ্ট দেবতার দান! কিন্তু বড় দুরন্ত হয়েছে ওটা! আর শুধুই কি তাই? সংসারের ক্ষতিই কি কম করে? কোন জিনিসের উপর দরদ নেই! ফকির, বোষ্টম, ভিখারী দেখলে তো সামনে

যা পাবে দু'হাতে টেনে বার করে দেবে। (নেপথ্যে ঘরের দিকে তাকাইয়া) থাক দস্যি ওই ঘরে আটক!

( নবীনের প্রবেশ )

দেখো নবীন, তোমাদের সকলকে বলা রইলো—যখন বাড়ীতে ভিখারী বোষ্টোম আসবে, বিলেকে পাহারায় রাখবে। কিছুতেই ওকে বাইরে যেতে দেবে না।

নবীন। আচ্ছা। কিন্তু মা, বিলুভাইকে কি ওঘরে আটকে রেখেছেন?

ভুবন। হ্যাঁ, কেন?

নবীন। তবেই হয়েছে! এতক্ষণ তা হলে ঘর একেবারে পরিষ্কার।

ভুবন। সে কি নবীন?

নবীন। হ্যাঁ মা ঠিক! ~~ঘর এতক্ষণ পরিষ্কার হয়ে গেছে।~~ আমি বাইরে থেকে আসার সময় দেখি, আপনার ঘরের নীচেতে রাস্তায় এক ভিখিরী। উপর থেকে জানলা গলিয়ে বিলুভাই ফেলে দিল তার গায়ের উপর একখানা কাপড়। ~~আমি কেড়ে নিয়ে এলাম—এই~~ দেখুন সেই কাপড়।

ভুবন। সর্বনাশ! দাঁড়া সর্বনেশে ডাকাত—দেখাচ্ছি তোকে মজা।

( ক্ষিপ্ত হইয়া দ্রুত ভিতরে প্রস্থান )

নবীন। ~~হ্যাঁ, বড়লোকের ছেলে বটে!~~ বিলুভাইয়ের নজর কত উঁচু! গরীব দুঃখীর উপর কত দয়া! ~~যে যা চায়, তাই দিয়ে দেয়। গালমন্দ করো, মারধোর করো তাতে তার বয়েই গেল।~~ হবে না কেন? যেমন দয়াময়ী পুণ্যবতী মা, তেমনি সদাশিব দানশীল বাপ। বড় হলে বিলুভাই বাপ মায়ের নাম রাখবে—মস্ত দাতা হবে। ~~যাই, এখানা আবার জায়গায় রেখে আসি।~~

( প্রস্থান )

(বিলের চুলের মুঠো ধরিয়া সজোরে টানিতে টানিতে ক্রুদ্ধ ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবন। বল, এমন কাজ আর করবি কি না ?

বিলে। করবো, এক'শবার করবো।

ভুবন। এখনও বলছিস্ করবি ? তোর কান টেনে আজ ছিঁড়েই ফেলবো।

(কান টানিতে রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল বিলে)

কত আরাধনা করে শিবের কাছে করেছিলাম পুত্র কামনা! তিনিও আমায় এমন ফাঁকি দিলেন ? নিজে না এসে আমার কপালে পাঠালেন কিনা একটা ভূত !

বিলে। কি ? আমি ভূত ? (ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে টানিয়া ধরে মায়ের চুল) আমি ভূত ? আমি ভূত ?

ভুবন। নিশ্চয় ভূত ! তা না হলে এমন হয় ? ওরে ছাড়, ছাড়—আমার চুল ছিঁড়ে গেল যে ! ছাড়, ছাড়—

বিলে। না ছাড়বো না। কিছুতেই ছাড়বো না—

ভুবন। উঃ, আমি যে গেলাম ! ছাড়, ছাড—

(ছাড়াইতে না পারিয়া দু'হাতে জড়াইয়া ধরেন বিলেকে বুকের মাঝে। তার মাথায় রাখেন হাত)

(উচ্চৈস্বরে) শিব, শিব, শিব !

(স্তব্ধ বিলে নিমিলিত চোখে ঢলিয়া পড়ে মায়ের বুকে)

এ কি হলো, বিলে এমন হয়ে গেল কেন ? এ আমার কি হলো ? (কাতর স্বরে) শিব শঙ্কর, জয় বাবা বীরেশ্বর !

বিলে। (চোখ খুলিয়া) তুমি অমন করছো কেন মা ?

ভুবন। তুই যে কেমন হয়ে গেলি বাবা!

বিলে। আমি কি খুব দুষ্টুমী করেছিলাম মা?

ভুবন। হ্যাঁ বাবা।

বিলে। আর আমি কক্ষনও দুষ্টুমী করবো না মা।

ভুবন। হ্যাঁ বাবা, করো না। তুমি আমার লক্ষ্মী সোনার চাঁদ ছেলে। চলো তোমায় খেতে দিই। মহাদেব, বীরেশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সত্য, তুমি সত্য।

(কপালে হাত ছোঁয়াইয়া প্রণাম)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### বিশ্বনাথের বৈঠকখানা

নবীন। ওঃ, কি বিশ্বাসঘাতক এই মেয়েমানুষ জাতটা! এরা না পারে কি—এ্যাঁ? এরা সব পারে। নিজেদের গরজে এরা স্বামীকে বিষ খাওয়াতে পারে—ছেলের বুকে ছুরী বসাতে পারে। ওঃ, ভাবতে গেলে আমার মাথায় খুন চড়ে যায়। নাঃ, বিয়ে জিনিসটাই অতি কদর্য—আর পুরুষ জাতটাই বোকা। তা না হলে এই রাক্ষুসীদের ছলাকলায় ভোলে? এই নাক মলছি, কান মলছি! আর যদি বিয়ের কথা ভাবি, তবে এই শর্মা মুচির কুকুর। ( নাক কান মলা )

( কাঁধে সীতার মূর্তি লইয়া বিলের প্রবেশ )

বিলে। এখানে একলা কি করছো নবীনদা?

নবীন। মনটা ভাল নেই ভাই আজ ক'দিন!

বিলে। কেন, কি হলো?

নবীন। সে আর তুমি শুনে কি করবে ভাই! তা তোমার কাঁধে ওটা কি? পুতুল?

বিলে। না না, পুতুল নয়—মা-জানকী!

নবীন। ( ক্রুদ্ধ হইয়া ) ফেলে দাও, ফেলে দাও ভাই—এক্ষুনি ভেঙে ফেলো ওই পুতুল!

বিলে। কেন, ভেঙ্গে ফেলবো কেন? আমি যে এঁকে পূজা করি!

নবীন। না—না ভাই! ও যে মেয়েমানুষ!

বিলে। ঝ্যাঃ, ইনি মানুষ হবেন কেন—ইনি যে দেবী!

নবীন। আরে ভাই, ও দেবীই হোক আর মানুষই হোক—মেয়ে গন্ধ যেখানে

আছে, সেখানেই সর্বনাশ। ওরা সবাই সমান শয়তান। ওদের কোন কথাই শুনো না। আর বাঁচতে যদি চাও— বিয়ে কক্ষনো করো না। অমন পাজী কাজ আর নেই।

বিলে। সে কি নবীনদা? বিয়ে যদি খারাপ কাজ তবে আমার বাবা বিয়ে করেছেন কেন?

নবীন। আরে ভাই, তোমার বাবার কথা ছেড়ে দাও। তিনি তো দেবতা!

বিলে। তা, আমার মা'ও তো মেয়েমানুষ। তাঁর কথাও তা হলে শুনবো না?

নবীন। তোমার মায়ের কথা আলাদা! তিনি কি মানুষ? তিনি দেবী। অমন মা ক'টা আছে?

বিলে। আচ্ছা নবীনদা! শ্রীরামচন্দ্র তো ভগবান! তবে তিনি বিয়ে করেছিলেন কেন?

নবীন। যেমন করেছিলেন, তেমনি তার ফলও হাতে হাতে পেয়েছিলেন! চোখের জলে কাটাতে হলো সারাটা জীবন! রামায়ণ শুনেছো তো?

বিলে। হুঁ, মায়ের কাছে রামায়ণের সব গল্প শুনেছি আমি!

নবীন। তবেই বোঝো, আমার কথা ঠিক কি না? এই বিয়ে করেছিলেন বলেই তো রামচন্দ্রের এত দুঃখ কষ্ট। বিয়ে করলেন, আর কিছু দিনের মধ্যেই বনবাস। ফলে দশরথের মৃত্যু—আর অযোধ্যাপুরী একেবারে শ্মশান। গেলেন বনে, রাবণ করলো সীতাকে চুরি – ফলে সোনার লঙ্কা একেবারে ছারখার। ফিরলেন সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায়! প্রজারা করলো সন্দেহ—হলো সীতার বনবাস। ফলে, কেঁদে কেঁদেই কাটলো রামচন্দ্রের সারাটা জীবন! তাহলে দেখলে ভাই, বিয়েটা কি পাজী জিনিস!

বিলে। (চিন্তিতভাবে) হুঁ, ঠিকই বলেছো নবীনদা। আমি কক্ষনও বিয়ে করবো না।

নবীন। হ্যাঁ, এই তো পুরুষের মত কথা। বিয়ে কখনও করো না।

(প্রস্থান)

বিলে। তা হলে আমি এখন করি কি? সীতাদেবী তো মেয়েমানুষ—কি করে এঁর পূজা করি?

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবন। এই বিলে! আমি সারা বাড়ী খুঁজছি, আর তুই এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস্?

বিলে। (কাঁদোকাঁদো ভাবে) মা, আমার সর্বনাশ হলো!

ভুবন। কেন, কি হলো রে?

বিলে। আমি আর সীতাদেবীকে পূজা করতে পারবো না!

ভুবন। কেন, কি অপরাধ করলেন উনি?

বিলে। উনি যে মেয়েমানুষ! নবীনদা বলেছে, মেয়েমানুষকে বিয়ে করাও চলবে না—পূজা করাও চলবে না।

ভুবন। এই দেখো নব্‌নের কাণ্ড! আবার কি খেয়াল ঢুকিয়ে দিয়ে গেল এই পাগলের মাথায়। নারে, নব্‌নে কিছু জানে না।

বিলে। না মা, নবীনদা যা বলে তা ঠিক! ও অনেক জানে।

ভুবন। (হাসিয়া) তাই নাকি? বেশতো, তাই যদি হয়—তাতেই বা কি? তুই পুরুষের পূজা কর। দেবাদিদেব বীরেশ্বর ভোলানাথ শঙ্কর—পুরুষ। তুই তাঁরই পূজা কর।

বিলে। (হাসিয়া) হ্যাঁ মা, আমি তাই করবো। আজই আমি কিনে আনবো মহাদেব। ঠিক, তাইই করবো আমি!

(প্রস্থান)

ভুবন। (হাসিয়া) রোজ নূতন বায়না, নূতন খেয়াল! কি যে করি এই পাগলকে নিয়ে।

## তৃতীয় দৃশ্য

### ভুবনেশ্বরীর শোবার ঘর

( সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ )

**ভুবন।** যোগসিদ্ধি মহাতেজা জনক নামেতে রাজা
আমি সীতা তাহার নন্দিনী।
দশরথ সুত রাম নব দূর্বাদল শ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি ॥
শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর ঘর,
কতমত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত শাশুড়ী গণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক ॥

( বিলের প্রবেশ )

**বিলে।** উঃ, কি যে করি! এত ধ্যান করছি, কিন্তু জটা আর বাঁধে না!

( দুই হাতে আপন মাথার চুল টানাটানি )

**ভুবন।** কিরে বিলে, চুল টানাটানি করছিস কেন অমন করে? চুল যে ছিঁড়ে যাবে।

**বিলে।** আচ্ছা মা, দেখতো আমার চুল খুব বড হয়েছে কিনা? আর জটা বেঁধেছে কিনা?

**ভুবন।** কেন রে, তাতে আবার কি হবে?

**বিলে।** শিবঠাকুরের মত জটা গজালে তিনি আমায় কৈলাসে যেতে দেবেন। কত ধ্যান করছি, কিন্তু কিছুতেই গজাচ্ছে না জটা।

ভুবন। ধ্যান করলে কি হয় ?

বিলে। শিবঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায়। আর দেখতে পেলেই এত বড় জটা গজিয়ে যায়। দেখনা মা, আমার জটা গজালো কি না ?

ভুবন। তাই নাকি ? কই, এদিকে আয়তো দেখি !

( বিলের মাথায় হাত দিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া )

হুঁ, একটু একটু যেন জটা জটা মনে হচ্ছে !

বিলে। ( হতাশার স্বরে ) মোটে একটুখানি ? তবে আর কি হলো ? ধ্যান বোধ হয় ঠিক মত হচ্ছে না আমার ! এই চল্লাম আমি ধ্যান করতে। যতক্ষণ না এই এত্তবড় জটা গজায়, কিছুতেই উঠবো না আমি !

( দ্রুত প্রস্থান )

ভুবন। ( হাসিয়া ) কি পাগল ছেলেরে বাবা ! সব সময় একটা না একটা খেয়ালে আছে।

( এ্যাটর্নির বেশভূষায় সজ্জিত বিশ্বনাথের প্রবেশ )

( প্রণাম করিয়া রামায়ণ বন্ধ করিয়া রাখিয়া ভুবনেশ্বরী উঠিলেন। )

ভুবন। আজ এত তাড়াতাড়ি এলে যে ?

বিশ্বনাথ। আজ বিশেষ সুসংবাদ আছে ভুবন !

ভুবন। ( ঈষৎ হাসিয়া ) কোন নির্দোষীকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে এলে বুঝি ?

বিশ্বনাথ। ( সবিস্ময়ে ) ফাঁসিতে ঝুলিয়ে !

ভুবন। তা ছাড়া তোমাদের আবার শুভসংবাদ কি ? নির্দোষীকে দোষী প্রমাণ করা, চোরকে সাধু প্রমাণ করা—সাধুকে খুনে প্রমাণ করে ফাঁসীতে ঝোলানোই তো তোমাদের কাজ !

**বিশ্বনাথ।** ওঃ, আমাদের উপর তোমার ভয়ানক রাগ দেখছি!

**ভুবন।** হবে না? টাকার খাতিরে তোমরা দিনকে রাত করো। সত্য মিথ্যার কোন বালাই তোমাদের নেই।

**বিশ্বনাথ।** কেন, আমরা কি কোন ভাল কাজ করি না? আমরাও তো মানুষ –

**ভুবন।** হ্যাঁ, মানুষ – কিন্তু তোমরা আগে উকিল, তারপর মানুষ।

**বিশ্বনাথ।** এ অভিযোগের জবাব তো আইন-শাস্ত্রের গণ্ডির ভিতর পড়ছে না!

**ভুবন।** তাতো পড়ছেই না। আর ওর বাইরের কিছু চোখেও পড়ে না তোমাদের।

**বিশ্বনাথ।** না ভুবন। এ আমাদের উপর তোমার অবিচার। আমরা মানুষও নই অমানুষও নই। আমরা সত্যান্বেষী। নীতির চোখে, ন্যায়ের চোখে মানুষ-অমানুষ কিছু নেই। কিন্তু এর বাইরে আমাদের যে সত্তা—

**ভুবন।** (হাসিয়া) এই দেখো – আবার সুরু হলো বক্তৃতা! ওগো, এটা আদালত নয়, আর আমিও বিচারপতি নই যে, বক্তৃতা দিয়ে আমাকে বোঝাতে হবে।

**বিশ্বনাথ।** হুঁ, মুসকিল তো আমাদের এইখানে। আদালতের সামনে আমরা ছয়কে নয় করি। কিন্তু এই আদালতের সামনে, (~~দোর্দণ্ড বিচারপতির আড়ায়~~) সব বুদ্ধি-শুদ্ধি গুলিয়ে যেন কেমন হয়ে যাই।

**ভুবন।** (হাসিয়া) থাক, থাক, – খুব হয়েছে এ্যাটর্নিমশায়! নাও এখন বলো তোমার শুভসংবাদটা।

**বিশ্বনাথ।** একটা বড় মামলায় আজ জয়লাভ হয়েছে আমার। সুনামও হয়েছে অর্থাগমও হয়েছে বেশ। আজ যা চাইবে তুমি, তাইই আমি দোবো তোমাকে।

**ভুবন।** ওঃ, একেবারে দাতা-কর্ণ!

**বিশ্বনাথ।** হ্যাঁ। এখন বলো কি চাই তোমার।

বন। দেবেই যদি, তবে তুই জোড়া আটপৌরে শাড়ী কিনে দাও আমায়।

শ্বনাথ। ( সবিস্ময়ে ) কেন, কাপড় কি তোমার নেই ?

বন। না না, আমার জন্যে নয়! ও বাড়ীর হারানের বউ, কাপড় অভাবে বেরুতে পারে না ঘর থেকে—তাকেই দেবো।

শ্বনাথ। বেশ, সরকার মশাইকে দিয়ে আজই আনিয়ে দেবো। বলো, আর কি চাই ?

বন। আর—কানাইয়ের বড় অভাব, তার ছেলেটার একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও।

শ্বনাথ। বেশ, কানাইকে ডেকে করে দেবো সেই ব্যবস্থা।

বন। আর, আর একটা জিনিস আমায় দেবে ?

শ্বনাথ। সঙ্কোচ কেন ? আমি তো বলেছি, যা আজ চাইবে—তাই-ই দেবো তোমায় ?

বন। অনাথা হারুর মা বুড়ী কাশী যাবে—পোনেরোটা টাকা যদি তাকে—

শ্বনাথ। বাঃ বাঃ—তোমার এ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ভুবন। কেউই রিক্ত ফিরে যায় না এ দ্বার থেকে। কে জানে, আরও কতজন তোমার গোপন করুণায় ধন্য হয়ে যায়!

বন। তোমার যদি অসুবিধা হয়, তবে—

শ্বনাথ। না না—আমায় ভুল বুঝো না ভুবন। যাকে যা দিয়ে তোমার তৃপ্তি—তাকে তাই-ই দাও। ঐশ্বর্যের লোভ বা সঞ্চয়ের মোহ আমার নেই। তুমি তো জানো ভুবন, সন্ন্যাসী পিতার সন্তান আমি! ঐশ্বর্য আমি নিয়েও আসিনি পৃথিবীতে, যাবার বেলায় এ থেকে নিয়েও যাবো না কিছুই। আমি যাবো—বেচে থাকবে শুধু, যা আমি দিয়ে যাবো। আলো-আঁধারে, সুখে-দুখে ভরা দুদিনের এই পৃথিবীর বুকে এসে—আঁধার পিছনে রেখে, নিরাশা ঠেলে ফেলে—যতটুক পারো আনন্দ লুটে নাও।

সুখী করো, আনন্দ দাও। আপন অশ্রু মুছে যাক, অপরের অশ্রু মুছিয়ে দাও—এই তো আমার নীতি ভুবনেশ্বরী।

ভুবন। (মুগ্ধ ভাবে) জানি, জানি ওগো, আমি সব জানি! আমার অন্তর যে তোমারই অন্তরের ছবি।

বিশ্বনাথ। যাক নিজের জন্যে তো কিছুই চাইলে না ভুবন?

ভুবন। আমার তো কোন অভাব নেই। আমি যে সবই পেয়েছি তোমার।

(নেপথ্যে নবীনের চিৎকার—ওরে বাপ্। সাপ, সাপ, সাপ! এই এতবড় গোখরো সাপ!)

ভুবন। (চিৎকার করিয়া) সেকি! কোথায় সাপ?

(নেপথ্যে নবীন—ওই যে ওই ঘরে—বিলের মাথার উপর)

ভুবন। বিলের মাথার উপর সাপ!

বিশ্বনাথ। কি সর্বনাশ!

(ছুটিয়া উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

ভুবন। মহাদেব, বীরেশ্বর, ভোলানাথ, আমার বিলেকে রক্ষা করো—রক্ষ করো।

বিশ্বনাথ। ওই যে ফণা নামিয়ে চলে যাচ্ছে।

ভুবন। শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর!

(বিলেকে বুকে জড়াইয়া ভুবন ও বিশ্বনাথের প্রবেশ)

ভুবন। বিলে, বিলে! শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু।

বিলে। (চোখ খুলিয়া) কি হয়েছে মা?

বন। চোখ মেলেছিস বাবা! সাপ কামড়ায়নি তো? বাবা বীরেশ্বর রক্ষা করেছেন।

লে। সাপ! কোথায় সাপ মা?

শ্বনাথ। (সবিস্ময়ে) সে কি! তুই কিছুই জানিসনে বিলে?

লে। না তো!

বিশ্বনাথ। ওখানে বসে কি করছিলি তুই?

লে। শিব ঠাকুরের ধ্যান করছিলাম।

শ্বনাথ। ধ্যান করছিলি! কিছুই জানতে পারিসনি?

বিলে। না তো!

শ্বনাথ। (গম্ভীরভাবে) হুঁ। দেখ ভুবন, বিলে আমার সন্ন্যাসী হবে। আমার বাবাও সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। পৌত্রান্ত ফল—ও-ও সন্ন্যাসী হবে।

বন। (বিরক্ত স্বরে) ও কি কথা! বিলে সন্ন্যাসী হতে যাবে কোন দুঃখে? ঠাকুরের আশীর্বাদে বিলে আমার রাজ-রাজেশ্বর হোক। আচ্ছা, আমি তোমার খাবার দিতে বলে আসি।

(প্রস্থান)

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) বড় হয়ে তুই কি হবিরে বিলে?

বিলে। আমি সন্ন্যাসী হবো বাবা।

বিশ্বনাথ। কিন্তু তোর মা যে বলে তুই রাজ-রাজেশ্বর হবি?

লে। না বাবা, তার চেয়ে কোচোয়ান হবো।

শ্বনাথ। (হাসিয়া) সে কি রে? কোচোয়ানের তো তা হলে খুব বড় পদ!

লে। বড় পদ নয়? আমি কি যে সে কোচোয়ান হবো? আমার গাড়ীতে যে চড়বে তাকে একেবারে ঠিক্ ঠিক্ ঠিকানায় পৌঁছে দেবো।

(প্রস্থান)

বিশ্বনাথ। ( হাসিয়া ) আচ্ছা তাই দিস। ( আত্মগতভাবে ) ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরেছিলেন অশ্ববল্গা। তুইও টেনে ধরতে চাস ঘোড়ার রাশ। কে জানে সেই টানে কোথায় পড়বে টান—ঘটবে কি অঘটন।

( ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ )

ভুবন। চলো, তোমার খাবার দিতে বলেছি।

বিশ্বনাথ। চলো যাচ্ছি।

ভুবন। দেখো, একটা কথা। কেন তুমি বিলেকে সন্ন্যাসী হবার কথা বললে ?

বিশ্বনাথ। তাতে কি হয়েছে ? ও আরও কি হতে চায় জানো ? ও হতে চায় কোচোয়ান !

ভুবন। যা ওর অদৃষ্টে আছে, তাই হোক—শুধু সন্ন্যাসী যেন না হয় !

বিশ্বনাথ। সন্ন্যাসীদের উপর কেন তোমার এই বিরাগ ভুবন ?

ভুবন। বিরাগ নয়—ভয়। ঠাকুর সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। চিরদিন তোমাকেও দেখছি পার্থিব সব ব্যাপারে থেকেও, অন্তরে তুমি বৈরাগী। ওর ক্রিয়া-কলাপেও মনে হয়—এ পৃথিবীর কোন কিছুতেই ওর মোহ নেই। এর বাইরের কোন টানে যেন ও অস্থির হয়ে বেড়ায়। ওগো, তাই তো আমার এত ভয়।

বিশ্বনাথ। ভয় কেন ভুবন ? রাজ-রাজেশ্বরের জননী হওয়ার চেয়ে সন্ন্যাসী জননী হওয়া পরম ভাগ্যের, পরম গৌরবের কথা। জানো তাদের দানে কথা ? এই ধরার বুকে কত রাজ-রাজেশ্বর এলো—গেল। পৃথিবীর য কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর ভোগ করে গেল তারা—কিন্তু দিয়ে গেল ন কিছুই। আর মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী—পৃথিবীর নিলো না কিছুই, আর দিে গেল যা, তারই উপর আজ জগৎ দাঁড়িয়ে আছে ! যুগ-যুগান্তরের সাধনাল

যে সত্য দিয়ে গেলো তারা, তারই ক্ষীণায়মান জ্যোতি এখনও এই কলুষিত মানব জাতিকে ধ্বংসের চিরান্ধকার থেকে রক্ষা করে চলেছে।

ভুবন। ওগো, ভুল বুঝো না আমায়। ও যে আমার ইষ্টের দান। ওকে হারালে কি নিয়ে বাচবো আমি ?

বিশ্বনাথ। ইষ্টের দান তাঁরই উপর নির্ভয়ে ছেড়ে দাও ভুবন। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন। বিলের ভাগ্যদেবতা ঠিকই চালাবেন তাকে তার নির্দিষ্ট পথে। তুমি আমি কে ?

## চতুর্থ দৃশ্য

### বিশ্বনাথের বৈঠকখানা

( সন্দেশ খাইতে খাইতে বিলের প্রবেশ )

বিলে। আঃ কি মজা, কি আনন্দ! যাবো, যাবো—আর দুই ইঞ্চি বাড়লেই আমি যাবো।

( ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ )

ভুবন। কোথায় যাবিরে বিলে?

বিলে। মা, দেখোতো আমায় মেপে আমি দুই ইঞ্চি বেড়েছি কিনা?

ভুবন। সে আবার কিরে?

বিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কাল রাতেই দু ইঞ্চি বেড়ে গেছি আমি। দেখ না মা, একবার আমায় মেপে?

ভুবন। একরাতে কেউ বাড়ে দু'ইঞ্চি? আর কি হবে দু'ইঞ্চিতে?

বিলে। ওই দুই ইঞ্চিতেই তো আটকে গেছি আমি। ওইটুকু হলেই, ব্যা কাশিমচাচার সঙ্গে একেবারে কাশ্মীর।

ভুবন। ও, সেই জন্যেই এত মাপামাপি? ( হাসিয়া ) তা বেশ! তু খাচ্ছিস কি ও?

বিলে। কাশিমচাচা সন্দেশ দিয়েছে, তাই খাচ্ছি।

ভুবন। সর্বনাশ! মুসলমানের ছোঁয়া সন্দেশ খাচ্ছিস? ফেলে দে।

বিলে। কেন, ফেলে দেবো কেন? আমি তো প্রায়ই খাই।

ভুবন। মুসলমানের ছোঁয়া খেলে জাত যায়।

বিলে। কেন, জাত যাবে কেন? সন্দেশ তো একই দোকানের তৈরী। তবে হিন্দুর ছোঁয়াতে জাত যায় না—মুসলমানে ছুঁলে জাত যায়? তা কেন হবে?

ভুবন। হ্যাঁ, তাই হয়।

বিলে। মুসলমানও মানুষ, আমরাও মানুষ।

ভুবন। ফের মুখের উপর তর্ক? উকিলের ছেলে এখন থেকেই উকিল হয়ে উঠছে। যেমন বাপের জাত বিচার নেই—তেমনি ছেলেও হয়ে উঠেছে ম্লেচ্ছ। ঘেন্নায় মরে যাই। জাত-জন্ম কিছুই আর রইলো না। ছুঁসনে ছুঁসনে আমায় হতভাগা!

(রাগে গরগর করিতে করিতে প্রস্থান)

বিলে। ওঃ বাবা! একটুখানি ছোঁয়াতেই জাতটা চলে যায়? এতো তা হলে ভারি ঠুনকো জিনিস? (নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া) নবীনদা, ও নবীনদা!

(নেপথ্যে)

নবীন। কি বিলু ভাই!

(নবীণের প্রবেশ)

বিলে। বলি যাচ্ছো কোথায়? এদিকে এসো, ভয়ানক দরকার।

নবীন। বলো কি দরকার? দেরী হলে মা বকাবকি করবেন।

বিলে। মা বকবে? তাতে কি? মা তো সবাইকেই বকে। এইতো আমায় কত বকে গেল।

নবীন। বলো তোমার কি দরকার।

বিলে। আচ্ছা নবীনদা, জাতটা কি ?

নবীন। জাতটা ? ( ভাবিয়া ) জাতটা, জাত আর কি।

বিলে। কিন্তু সেটা কি ?

নবীন। কেন ? এই যেমন ধরো, হিন্দু, মোছলমান, খিষ্টেন এই আর কি !

বিলে। মুসলমানের ছোঁয়া খেলে জাত যায় ?

নবীন। ওঃ বাবা। যায় না ? একেবারেই যায়।

বিলে। কেন ?

নবীন। তা জানি না— তবে যায়।

বিলে। জানো না তবে মানো কেন ?

নবীন। মানবো না ? এরা যে সব আলাদা।

বিলে। এরা আলাদা কেন ?

নবীন। এটা আর জানো না ভাই ? এরা কেষ্ট পূজা করে, ওরা খেষ্ট পূজা করে—তারা করে আল্লার নামাজ।

বিলে। সে তো সবই একই ভগবানের নাম।

নবীন। হুঁ হুঁ, কি যে বলো ভাই ! এরা সবাই আলাদা ! আমাদের কেষ্ট— মাথায় চুড়ো, হাতে বাঁশী, কি সুন্দর দেখতে ! আর খেষ্ট—একমুখ দাড়ি, নেংটি পরা, এক তেকেঠেতে ঝুলানো। আর আল্লার নাকি কোন রূপই নেই। তা আর আলাদা হবে না ?

বিলে। আচ্ছা, এরা সব মরলে কি হয় ?

নবীন। মরলে সবই মাটি হয়ে যায়। তুমি আমার দেরী করে দিলে। যাই, বাবুর আসার সময় হয়ে গেছে।

( প্রস্থান )

বিলে। ভারি মজা তো ! এখানেও এক রকম—মরেও হয়ে যায় এক রকম !

তবে কেন এই জাতের তফাৎ? দেখবো এখুনি যাচাই করে কোন জাতের কি আস্বাদ।

(পাশের তাকের উপর সাজাইয়া রাখা হুঁকার সারির কাছে সরিয়া আসিয়া)

এটা খৃষ্টান, এটা মুসলমান! বাঃ বাঃ, হিন্দুর ভিতর আবার দুটো জাত—কায়স্থ আর বামুন। দেখা যাক এবার কোনটার কি স্বাদ।

(পরপর সব কটাকেই একবার টানিয়া)

থুঃ থুঃ থুঃ। সব কটার গন্ধই এক রকম—কোনটারই কোন আস্বাদ নেই। সব কটাই তো একই রকম ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ করে! তবে কেন এটার গায়ে লাল সুতো, এটার গায়ে শাদা? এটার গলায় কড়ি বাঁধা? দেখি আবার টেনে। (আবার হুঁকা টানিতে লাগিল)

(বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্বনাথ। কিরে বিলে, এখানে একলা করছিস কি? ওকি, লুকিয়ে তুই তামাক খাচ্ছিস নাকি?

বিলে। না, জাত চেখে দেখছি। এটা খৃষ্টান, এটা মুসলমান, এটা কায়স্থ—এটা বামুন। কোনটার কি আস্বাদ তাই দেখছি।

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) কেন রে? তাতে কি হবে? এ খেয়াল তোর মাথায় কে দিলে? আর এতো ভাবছিস্ কি?

বিলে। ভাবছি, চিহ্ন বদলে সবগুলোকেই এক চিহ্ন করে দিলে কেমন হয়। আর সব জাতগুলোকেই কি করে এক জাত করা যায়।

বিশ্বনাথ। (গাঢ়স্বরে) কাজটা বড়ই শক্তরে বিলে! তুই কি পারবি? যদি পারিস, দে সব ভেঙ্গে।

বিলে। বাবা, জগতে কি এমন কিছুই নেই যাতে এই জাতটাত সব উঠে যায়?

বিশ্বনাথ। কি জানি বাবা! হয়তো আছে। কিন্তু আমি তার সন্ধান জানি না। তুই দেখিস্ চেষ্টা করে, যদি তার সন্ধান পাস্।

বিলে। হ্যাঁ, তাই দেখতে হবে। একবার যদি তার সন্ধান পাই—তবে সবার আগে ভাঙবো এই জাতের বিচার।

( প্রস্থান )

বিশ্বনাথ। ( আত্মগত ভাবে ) কাজটা বড়ই শক্তরে বিলে! কচি মাথার পক্ষে ভারটা যে বড়ই গুরু! পারবি কি বাবা, তোর ওই কচি হাত দুটো দিয়ে যুগ-যুগান্তরের এই কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে দিতে? কে জানে, হয় তো তুই পারবি—হয় তো তুই পারবি না বিলে। তবুও দেখ যদি পারিস এই বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে।

( ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ )

ভুবন। দেখো, তোমার সঙ্গে আজ আমার ভয়ানক ঝগড়া আছে।

বিশ্বনাথ। কিন্তু আমার সঙ্গে কারোই ঝগড়া নেই।

ভুবন। কিন্তু আমার ঝগড়া আছে।

বিশ্বনাথ। বেশ তাহলে তুমি করো, আমি শুনি।

ভুবন। বলি, ও রকম চোখ বুজে থাকলে, সংসার আর কতদিন চলবে?

বিশ্বনাথ। কেন? বেশই তো চলছে। আমি খুব সুখেই আছি। আমার এ সুখের সংসার।

ভুবন। ( মুখ ঘুরাইয়া ) হ্যাঁ, সুখের সংসার! বলি, তোমার চোখে কি কিছু পড়ে?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, পড়বে না কেন? খুবই পড়ে। সবার আগে নজর পড়ে মক্কেলের উপর। তারপর—ক্লাব, পার্টি, ফিস্ট কোথায় কি হচ্ছে তার উপর। আর ঘরে ঢুকলেই নজর পড়ে তোমার উপর।

ভুবন। (হাসি মুখ ঝামটা দিয়া) ছাই পড়ে! বলি, সংসারে কোথায় কি হচ্ছে—তা একটু দেখতে হয়?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, তা দেখি তো! আমার যে চারটে চোখ আছে। এই দুটো দিয়ে দেখি বাইরের সব—আর ওই দুটো দিয়ে দেখি ভিতরের সব।

ভুবন। (হাসিয়া) তবে তো সব কর্তব্যই শেষ হয়ে গেল। না না, বিলেকে নিয়ে আমি বড়ই চিন্তায় আছি। এমন দুর্দান্ত হয়েছে ছেলেটা, আর এমনি অদ্ভুত তার সব ক্রিয়াকলাপ যে, আমি আর সামলাতে পারছি না তাকে।

বিশ্বনাথ। কেন, তুমি তো বেশ তদারক করছো তার।

ভুবন। না না। বাপ যদি একেবারেই কিছু না বলে, তবে মায়ের কাছে ঠিক শিক্ষা হয় না ছেলের।

বিশ্বনাথ। কেন হবে না? মায়ের কাছেই তো ছেলের শিক্ষা হয় সব চেয়ে ভাল। আর তুমি তো উপযুক্ত মা ভুবন! আমিও তো মায়ের কাছেই মানুষ। আমি কি উপযুক্ত হইনি? তবে বিলেই বা তোমার কাছে মানুষ হবে না কেন?

ভুবন। না, তবুও তোমার একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। পাঠশালার পড়া তার শেষ হয়ে গেছে! ছেলেটার ধারও খুব—কিন্তু খালি দুরন্তপনা করে বেড়াবে। ওকে এখন বড় স্কুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি—একটু শাসন করে দাও। কিন্তু দেখো, যেন বেশী বকাবকি করো না।

(প্রস্থান)

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) ছেলেকে উপদেশ দিতে হবে, শাসন করতে হবে—কিন্তু বেশী বকাবকি করা চলবে না। ভুবনের ছেলে অন্তপ্রাণ! অদ্ভুত জিনিস এই মাতৃস্নেহ।

( বিলের প্রবেশ )

**বিলে।** আমায় ডেকেছো বাবা ?

**বিশ্বনাথ।** হ্যাঁরে, শোন ! মাস্টারের কাছে গান শিখছিস তো ?

**বিলে।** হ্যাঁ।

**বিশ্বনাথ।** পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেছে ?

**বিলে।** হ্যাঁ, সে কবে শেষ হয়ে গেছে।

**বিশ্বনাথ।** এবার তোকে বড স্কুলে ভর্তি করে দেবো। তোকে ইংরাজী শিখতে হবে।

**বিলে।** না, আমি ইংরাজী পড়বো না।

**বিশ্বনাথ।** সে কি ! তোকে যে বিলেত যেতে হবে—ব্যারিস্টার হতে হবে ইংরাজী না শিখলে তা হবে কি করে ?

**বিলে।** না, আমি বিলাতও যাবো না, ব্যারিস্টারও হবো না। আমি শিখবে আমার দেশের ভাষা।

**বিশ্বনাথ।** কিন্তু অন্য দেশের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলে তবেই বুঝতে পার যায় নিজের দেশের জ্ঞানের প্রকৃত মর্যাদা।

**বিলে।** তাই নাকি ? ( ভাবিয়া ) আচ্ছা বাবা, তবে আমি ইংরাজী পড়বো

( প্রস্থান )

**বিশ্বনাথ।** ( আত্মগত ভাবে ) বিদেশী শিক্ষায় এই বিদ্বেষ ! কে জানে হয়তো এই ভাষাতেই বাজাবে তোর বিজয় ডঙ্কা। এই ভাষাতে একদিন তুই করবি বিশ্বজয়। কে জানে, কালস্রোতে কি এর ভবিষ্যত কে জানে বিলে, কোন পথে তোকে নিয়ে যাবেন তোর ভাগ্য দেবতা আমি আশীর্বাদ করি—যে বহ্নি জ্বলে তোর বুকে, তা যেন অকালে নিভে না যায়। তুই মানুষ হোস—তুই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দিস।

# প্রকাশ

## প্রথম দৃশ্য

### কেশব সেনের বাগান-বাড়ী

( বই হাতে কলেজের ছাত্র তরুণ নরেন্দ্রনাথ )

**নরেন।** কে আমি? কেন এসেছি এই ধরার বুকে? কোথায়ই বা আমার শেষ? ওই যে অসীম অনন্ত আকাশ, ওই যে চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা, এই যে শ্যামলা ধরণী—কি আছে এর অন্তরালে? কোন শক্তিতে আসে দিনের পর রাত—রাতের পর দিন? কার খেয়ালে ধরার বুকে কেউ বা হাসে—কেউ বা কাঁদে? ঈশ্বর কে? কোথায় তাঁর বাস? সত্যিই যদি ঈশ্বর থাকেন, কেন তবে ধরা দেবেন না তিনি? কিন্তু কেউই তো দিতে পারলো না তাঁর সন্ধান! তবে কি ঈশ্বর নেই? কিন্তু নেই, এ কথা ভাবতেই যে প্রাণের ভিতর জাগে অসীম বেদনা।

( কেশব সেনের প্রবেশ )

**কেশব।** এই যে নরেন! তোমাকে যেন আজ বিশেষ বিমর্ষ দেখছি।

**নরেন।** আজ্ঞে হ্যাঁ। মনটা বিশেষ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে আজ।

**কেশব।** কেন? তুমি একজন প্রমিজিং ইয়ং ম্যান। তোমাদের মত ছেলেরাই তো দেশের ভবিষ্যত। সামান্য কারণে তোমার মত ছেলের কি মুহ্যমান হয়ে থাকা শোভা পায়? সব অশান্তি ঝেড়ে ফেলে, পুরুষের মত এগিয়ে যাও।

**নরেন।** কোথায় যাবো, কেন যাবো—কি আমার নিশানা? কর্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হয়ে অন্ধকারে অনির্দিষ্টের পিছনে ছুটে বেড়ানোই কি শ্রেয়?

কেশব। তোমার কথা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু কর্মে যার প্রেরণা আছে, প্রবৃত্তি আছে—পথের নিশানা তার ঠিক হয়ে যাবেই। কর্ম-স্রোতে গা ঢেলে দাও—সব অশান্তি কেটে যাবে।

নরেন। সবাই দিয়ে গেছেন এই নীতি উপদেশ। কিন্তু শুধু কথাতেই তো প্রাণের মাঝে মেলে না শান্তির পরশ!

কেশব। বিশ্বাস, বৎস—বিশ্বাসই সব মিলিয়ে দেয়।

নরেন। বিশ্বাস তো অন্ধ। চোখ থাকতে অন্ধের মত চলতে আমি পারি না—চলতে আমি চাই না। আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই। আপনি পারেন আমায় নিঃসন্দেহ করে দিতে?

কেশব। বলো কি তোমার প্রশ্ন? কিসে তুমি নিঃসন্দেহ হতে চাও?

নরেন। দার্শনিকের মতে এই যে জড়-পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ-তারা—কে এর সৃষ্টিকর্তা? কার ইঙ্গিতে এ চলে—কে এর নিয়ন্তা?

কেশব। পরম কারুণিক, পরম-ব্রহ্ম ঈশ্বর।

নরেন। মানুষ কোথা থেকে এসেছে?

কেশব। ব্রহ্ম অংশ সম্ভূত এই মানুষ।

নরেন। কি তার চরম সার্থকতা?

কেশব। ওই ব্রহ্মেই পুনরায় লীন হয়ে যাওয়া।

নরেন। যেখানে ছিল, সেখানেই ফেরা যদি তার উদ্দেশ্য তবে কেন সে এলো?

কেশব। বয়সে তরুণ হলেও, তোমার জ্ঞান-পিপাসা প্রচণ্ড—প্রশ্নও জটিল। অধীর হয়ো না বৎস, এখানে আসা যাওয়া করো, উপাসনা করো—ক্রমে সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। বহু সাধনার ফলে এ সত্য লাভ হয়।

নরেন। হুঁ। আচ্ছা ধর্ম কি?

কেশব। যা মানুষকে ধারণ করে রাখে, ব্রহ্মবস্তু লাভের পথে এগিয়ে দেয়—তাই ধর্ম।

নরেন। সব ধর্মের উদ্দেশ্যই তাহলে এক?

কেশব। উদ্দেশ্য এক হতে পারে! কিন্তু তার সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

নরেন। কারণ?

কেশব। কেউ সরল পথে অতি সত্বর লক্ষ্যে পৌছে দেয়। আবার কেউ বন্ধুর বঙ্কিম পথে নিয়ে চলে—অবশেষে গন্তব্যে পৌছায় কিনা তাও অমীমাংসিত।

নরেন। তা হলে এই সরল শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি?

কেশব। মহান এই ব্রাহ্ম ধর্ম।

নরেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে এর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? যুগ যুগ ধরে যোগী ঋষিরা যে সত্যের আলো দিয়ে গেছেন, তা কি বৃথা বাতুলতা? কোন শক্তিতে তবে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেটা?

কেশব। হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিকতায় কলুষিত। পৌত্তলিকতা অতি পুরাতন ভ্রান্ত সংস্কার—তাই অনিশ্চিত।

নরেন। কিন্তু বেদ-উপনিষদের স্রষ্টা যোগী ঋষিরা দৃঢ় কণ্ঠে বলে গেছেন—ঈশ্বর সত্য ও জ্ঞাতব্য। আর এই মূর্তি পূজার ভিতর দিয়েই হয় তার বিকাশ। এ কথা কি তবে মিথ্যা?

কেশব। বেদ-উপনিষদ যে অভ্রান্ত তার কোন প্রমাণ যখন নেই—তখন নিশ্চয়ই সেটা সন্দেহের বিষয় বৎস!

নরেন। ঠিক, নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু মেনে নেওয়া অসম্ভব।

কেশব। এই তো তোমার মত ছেলের উপযুক্ত কথা! তোমাকে নিঃসন্দেহ করে দেবে মহান এই ব্রাহ্ম ধর্ম।

নরেন। ব্রহ্মের কি রূপ?

কেশব। ব্রহ্ম নিরাকার।

নরেন। কিসে তাঁর উপলব্ধি হয়?

কেশব। তাঁর উপাসনায়—তাঁর ধ্যানে।

নরেন। নিরাকারের ধ্যান কি করে সম্ভব ?

কেশব। সম্ভব বৎস, সম্ভব !

নরেন। আপনি ব্রহ্ম দর্শন করেছেন আচার্যদেব ?

কেশব। (বিব্রতভাবে) না, তা করিনি বৎস, তবে তাঁর ইঙ্গিত আমি পেয়েছি।

নরেন। আপনিও তো তবে প্রমাণ দিতে পারেন না। তবে কি করে—

কেশব। অধীর হ'য়ো না বৎস। তোমার তরুণ বয়সে বিষয়টি যত সহজ বলে মনে হচ্ছে বস্তুতঃ ঠিক তা নয়। ধৈর্য ও সাধনাই একমাত্র পথ।

নরেন। (স্বগত) সেই অতি পুরাতন নীতিবাদ! (প্রকাশ্যে) প্রাণের ভিতর অসীম ব্যাকুলতা আমায় দিশেহারা করে দেয়। তীব্র হতাশার জ্বালা আমায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। কোথায় হবে আমার এই ব্যথার শেষ ?

কেশব। হতাশার দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দাও বৎস। তোমার ভিতরে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা। আমি সুশিক্ষায় তোমায় পরম বাগ্মী অদ্বিতীয় আচার্য করে তুলবো।

নরেন। (প্রণাম করিয়া) আচার্য হতে চাই না আমি। আমি চাই এমন মানুষের সন্ধান যে দেখেছে ঈশ্বর, যে দেবে আমায় তাঁর পথের সন্ধান।

(প্রস্থান)

কেশব। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) অদ্ভুত প্রতিভা এই যুবকের। কে জানে কোন পথে হবে এর বিকাশ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### দক্ষিণেশ্বর। রামকৃষ্ণের ঘর

রামকৃষ্ণ। দেখ্ লেটো, খাবার সময় খাবি—ঠিক মত ঘুমাবি। খাওয়া-দাওয়া ঠিক না থাকলে শরীর থাকবে কেন? ভাঙা শরীরে কোন কাজই হয় না। আমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তোকে আমি সামলাবো কি করে?

লাটু। আচ্ছা বাবা

রাম। আর সন্ধ্যা বেলায় ঘুমাস কেন? ঘুমাবিই যদি, তবে ধ্যান করবি কথন?

লাটু। আচ্ছা বাবা, রাতমে নিদ যাবে না। খালি জপ-ধ্যান করবে।

রাম। আচ্ছা, তুই কি একেবারেই মুখ্যু হয়ে থাকবি? একটু বর্ণ-পরিচয় কর। বল—অ!

লাটু। আ।

রাম। আ।

লাটু। এঁ।

রাম। না, হলো না। আচ্ছা, ক-খ'টা একবার বলতো! বল, ক—

লাটু। কা।

রাম। খ।

লাটু। খা।

রাম। নাঃ, তোর লেখা-পড়া হবে না। ভগবান সূঁচের ভিতর দিয়ে উট পার করাচ্ছেন।

লাট্টু। ও হাম সমঝা বাবা। আপনি হামার ভিতর উট ঢুকাইযে দিয়েছেন আপকা কৃপাসে ও হি হামার সফল হো যায়! এহি হামারা সব তীবথ্। ইহাই হামারা সব কুছ মিলেগা—ব্যাস!

(প্রণাম ও প্রস্থান)

রাম। মা তুই আমায় লেটোকে দিলি। ব্রজের রাখাল পুত্ররূপে এনে দিলি—কিন্তু সে তো আমার এলো না? তবে কি তুই আমায় ফাঁকি দিয়ে ভুলালি মা? আর যে আমি পারি না। ওরে আমার প্রাণের প্রাণ, ওরে আমার তুলাল—ছুটে আয়, ছুটে আয—

(নরেনের প্রবেশ)

এসেছিস, এসেছিস নরেন! আঃ আয়—! (হাত ধরিয়া) কেমন করে, কেমন করে তুই এতদিন ভুলে ছিলি?

নরেন। (স্বগত) লোকে বলে ইনি উন্মাদ। নিশ্চয়ই পরিচিত বলে আমায় ভুল করেছেন। (প্রকাশ্যে) আমার হাত ছেড়ে দিন। আপনি ভুল করছেন, আমি আপনার অপরিচিত।

রাম। পরিচয়! তুই যে আমার, আমি যে তোর—শাশ্বত কালের এই পরিচয় যুগে যুগে লেখা আছে ধরণীর বুকে। ওরে পাষাণ, তোর আশা পথ চেয়ে কতকাল যে বসে আছি আ।ম! ওরে তুলাল, বুকে আয়, বুকে আয়—

(জড়াইয়া ধরিলেন)

নরেন। (স্বগত) অর্দ্ধ তো নয! এযে দেখছি সম্পূর্ণ উন্মাদ। (প্রকাশ্যে) আমায় ছেড়ে দিন।

রাম। (ছাড়িয়া দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) আমি জানি, আমি, জানি প্রভু তুমি

কে! জানি তুমি সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মহাতপা ঋষি—নররূপী নারায়ণ; জীবের কল্যাণ তরে ধরায় এসেছো!

রেন। কি অদ্ভুত কথা! আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ—আর ইনি বলেন কিনা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি! চমৎকার! (হাসিয়া) উন্মাদ ইনি তাতে কোন সন্দেহ আর নেই। কিন্তু তার মৌলিকতা আছে। দেখা যাক আরও কি বলেন। দেখুন, আমার একটু কাজের কথা ছিল।

(রামকৃষ্ণ খাটের তলায় রাখা হাঁড়ি হইতে সন্দেশ বাহির করিলেন)

ম। কাজের কথা? সে পরে হবে। এখন তুই একটু খা।

নরেন। না না, আমি খাবো না।

রাম। খা-না—খা!

নরেন। আমার অন্য সঙ্গীরা রয়েছে—তাদের ফেলে আমি খাবো না।

রাম। খাবে, খাবে—তারাও খাবে! তুই আগে খা। এই যে, আমি তোকে খাইয়ে দিই!

(খাওয়াইতে লাগিলেন)

রেন। (খাইতে খাইতে) উন্মাদই যদি ইনি হন—তবে কেন এত স্নেহ আপ্যায়ন? কিসের মোহে তবে এঁর কাছে ছুটে আসে এত লোক? তারাও কি সব উন্মাদ? না—সত্যই এই উন্মাদের অন্তরালে আছে কিছু সার? দেখা যাক এর শেষ কোথায়!

রাম। এইবার কাজের কথা বল্।

নরেন। সত্য কি?

রাম। ভক্ত, ভাগবৎ—ভগবান! তিনে এক—একে তিন।

নরেন। ধর্ম কি?

রাম। এই সত্য লাভের পথ।

নরেন। কর্ম কি?

রাম। এই সত্য লাভের চেষ্টা !

নরেন। কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ ?

রাম। সব ধর্মই শ্রেষ্ঠ। যার যাতে বিশ্বাস। যত মত—তত পথ।

নরেন। ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কি ?

রাম। প্রমাণ ? প্রমাণ—তুই, আমি, এই বিশ্বরাজ্য !

নরেন। সেই চিরাচরিত জবাব ! জানেন আপনি ঈশ্বর লাভের পথ ?

রাম। জানি।

নরেন। আপনি ঈশ্বর দেখেছেন ?

রাম। ( হাসিয়া ) হ্যাঁ, দেখেছি।

নরেন। ( ব্যঙ্গভরে ) আবার সেই বিকার ! সামান্য গ্রাম্য পূজারী, সে কিনা ঈশ্বর দেখেছে ! বাতুল, বাতুল—নিশ্চয়ই এ উন্মাদ !

রাম। ( হাসিয়া ) হ্যাঁ উন্মাদই তো ! উন্মাদ না হলে কি ঈশ্বর দেখা যায় ?

নরেন। মিথ্যা কথা ! এ আপনার বুজরুকী—আপনি কখনও ঈশ্বর দেখেনি। বিশ্ব-বিখ্যাত কেশব সেন দিতে পারেননি যে কথার জবাব—

রাম। ( হাসিয়া ) কি করে পারবে বাবা ? আলোর পিয়াসী নিজে যে, কি করে সে তোমায় দেখাবে আলো ? যে শক্তিতে কেশবের প্রতিষ্ঠা, অমন আঠারোটি রয়েছে তোমার ভিতর। কেশবের বুকে জ্বলে জ্ঞানের প্রদীপ —তোমার মাঝে ভাস্বর জ্ঞান-সূর্য।

নরেন। বলেন কি ? কোথায় ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, আর কোথায় এক সামান্য ছোকরা নরেন্দ্রনাথ ! লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বলবে !

রাম। তা আমি কি করবো বল্ ? মা যে আমায় দেখিয়ে দিলেন !

নরেন। মা দেখিয়ে দিলেন ? কোথায় আপনার মা ?

রাম। কেন, ওই মন্দিরে ?

নরেন। সেই ভ্রান্ত সংস্কার।

রাম। না না, ভ্রান্ত নয়—সংস্কারই সত্য হয়।

নরেন। কিন্তু ওই মা-টি তো আপনার জড়-পাষাণ! তিনি আবার কি বলবেন?

রাম। না না, পাষাণী নন্—মা আমার চিন্ময়ী।

নরেন। কিন্তু ঈশ্বর তো শুনি নিরাকার।

রাম। হ্যাঁ নিরাকার। স্বগুণ-সাকার মা-ই তো নির্গুণ নিরাকারে পরম ব্রহ্ম! এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এ-পিঠ দেখতে দেখতে ও-পিঠ চোখে পড়বেই।

নরেন। না না, ও আমি বিশ্বাস করি না। এ আপনার বিকার!

রাম। করবি, করবি! তোরও যখন এমনি বিকার হবে, তখন বিশ্বাস করবি।

নরেন। পারেন আপনি আমায় ঈশ্বর দেখাতে?

রাম। হ্যাঁ, পারি—যদি তুই আমার কথা শুনিস।

নরেন। না না, এ অসম্ভব! উন্মাদ, নিশ্চয় এ উন্মাদ!

রাম। উন্মাদ, উন্মাদ!

(অদ্ভুতভাবে হাসিয়া নরেনের স্কন্ধে পাদস্পর্শ করিলেন)

নরেন। এ কি! আমার প্রতি তন্ত্রীতে এ কিসের ঝঙ্কার! দেহ রোমাঞ্চিত, মস্তিষ্ক বিবস—চোখের উপর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মহাশূন্যে এক অনন্ত সত্তায় লীন হয়ে গেল! আমার চৈতন্য বুঝি লোপ হয়ে যায়। এই তো, এই তো তবে মৃত্যু! (চিৎকার করিয়া) ওগো, এ তুমি আমায় কি করলে? আমার যে বাপ মা আছেন!

রাম। (পা নামাইয়া) ও, তাই তো রে! তোর যে বাপ মা আছে! আচ্ছা, আচ্ছা—আস্তে আস্তে হবে।

(বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন)

(নরেন উঠিয়া চারিদিকে দেখিয়া)

নরেন। এই তো সবই ঠিক আছে। তবে মুহূর্তের মাঝে ওই পাদস্পর্শে আমার দেহ ও মনের উপর এ কি প্রলয় বয়ে গেল? এ কি স্নায়বিক

দুর্বলতা ? না না, এ সম্মোহন ! ওই ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল। কিন্তু এই মধুর আবেশ, এই সুখানুভূতি কি ইন্দ্রজালে সম্ভব ? কেন তবে আনন্দে ভরে ওঠে বুক, কানে বাজে অশরীরি সুর ? আর নয়, আর এখানে নয়। আমার আত্মপ্রত্যয় শিথিল হয়ে গেছে ! আমায় ভাবতে হবে, দেখতে হবে এর শেষ কোথায় !

( দ্রুত প্রস্থান )

রাম। ( হাসিয়া ) মাগো, সে আজ আমার বুকে এসেছে। শূন্য বুক আমার ভরে গেল ! তোর কাজ এবার তুই করিয়ে নিস্ মা। কিন্তু দেখিস, যেন সে অকালে ঝরে না যায় !

## তৃতীয় দৃশ্য

### ভবতারিণীর মন্দির চত্বর

রাখাল। দেখবি সাধু কাকে বলে। ঈশ্বরের নাম করতেই প্রেমাশ্রু ঝরে, বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

বাবুরাম। তাঁর সাথে দেখা হবে কি ?

রাখাল। হ্যাঁ হবে। আমি দেখি তিনি কোথায় আছেন! সাধুর কাছে রাত্রিবাসের ইচ্ছা আছে ?

বাবুরাম। থাকার সুবিধা হবে কি ?

রাখাল। তা হতে পারে!

বাবু। কি খাবো ?

রাখাল। যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে! তাছাড়া, মায়ের প্রসাদ তো আছেই! আচ্ছা, তুই একটু দাঁড়া, আমি তাঁকে নিয়ে আসি।

( প্রস্থান )

( লাটুর প্রবেশ )

লাটু। আপনি কে আছো বাবু?

বাবু। আমি বাবুরাম—রাখালের বন্ধু!

লাটু। রাখাল ভেইয়ার বন্ধু! তোবে তো হামারা ভি বন্ধু আছে। বাবুরাম ভাইয়া আছে!

বাবু। আপনি কে ?

লাটু। হামি লাটু আছি। বাবাঠাকুরকা দাস, রাখাল ভাইয়াদের নোকোর আছি। আবি হাম বাহার চলে ভাইয়া। আবার দেখা হোবে। তোখোন চিনবে লাটু ভাইয়াকে।

( প্রস্থান )

( অপর দিক হইতে রামকৃষ্ণ ও রাখালের প্রবেশ )

রাম। তুমি বলরামের আত্মীয়? তবে তো আমাদেরও আত্মীয় গো। তোমার জন্মস্থান কোথায়?

বাবু। আজ্ঞে, আঁটপুর!

রাম। ও, সেখানে তো আমি গেছি! ঝামপুকুরের কালু ভুলুদের বাড়ীও সেখানে।

বাবু। আজ্ঞে, আপনি তাদের কি করে জানলেন?

রাম। ঝামপুকুরে থাকতে ওদের বাড়ীতে আমি যেতাম!

( বাবুরামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া )

বেশ, বেশ! যাও মন্দিরে মাকে প্রণাম করগে!

( বাবুরামের প্রস্থান )

এ নূতন পাত্র! এতে দুধ রাখলে দই হবার ভয় নেই। হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। এমন পবিত্রতা দুর্লভ! আচ্ছা, নরেন আর কেন আসে নারে রাখাল? তাকে দেখার জন্যে বুকটা আমার গামছা দিয়ে নিংড়োয়!

রাখাল। ( অভিমান ভরে ) আপনার খালি নরেন—আর নরেন! আমরা যেন কেউই নই! আমরা যে এত আসছি, তা কিছুই নয়—শুধু নরেন কেন আসে না তাহার জন্যে ব্যস্ত! আপনি শুধু নরেনকেই ভালবাসেন!

রাম। ( হসিয়া ) আরে নারে না। তোদের সবাইকেই ভালবাসি। একই গাছের ছায়াতে তোরা সবাই আছিস। তবে কি জানিস বাবা? সূর্য আলো ঠিকই দেয়! তবে উঁচু জায়গায় আলো একটু বেশী পড়ে। সেটা জায়গার গুণ—সূর্যের কোন পক্ষপাত নেই! কারো উপর ঈর্ষা করতে নেই! যা মাকে প্রণাম করে আয়!

( রাখালের প্রস্থান )

মা, রাখাল ছেলেমানুষ তাই অভিমান করে। ওর অভিমান ঘুচিয়ে ঠিক পথে চালাস মা।

( লাটুর প্রবেশ )

লাটু। বাবা, লরেনভাইয়ার সাদি হোবে, ও আর ইদিকে আসবে না।

রাম। সে কিরে? নরেনের আবার বিয়ে কিরে?

লাটু। বহুৎ রূপেয়া মিলবে। লরেনভাইয়া বিলাইত যাবে। বহুৎ ধূমধাম হোবে।

রাম। মিথ্যা কথা। নরেন বিয়ে করতেই পারে না। ও যে ঈশ্বর-কোটির থাক—নিত্যশুদ্ধ অখণ্ডের ঘর।

লাটু। ( বিষণ্ণস্বরে ) হ্যাঁ বাবা, লরেনভাইয়া কি আর হামাদের ইখানে আসবে না?

রাম। আসবে, আসবে—যাবে কোথায়! ও যে এখানকার, ওকে যে আসতেই হবে। তা না হলে যে আমার আসা মিথ্যা।

লাটু। ( খুশী ভাবে ) হাঁ হাঁ, লরেনভাইয়া ঠিক আসবে—আসবে!

( প্রস্থান )

রাম। ( ব্যাকুলস্বরে ) মা, মাগো! তবে কি সব মিথ্যা হয়ে যাবে? তবে কি আমায় যা দেখালি সবই ভুল? সত্যিই কি নরেন কামিনীকাঞ্চনের মোহে সংসারের কালিমা মেখে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে? আমায় বলে দে মা—আমায় নিঃসংশয় করে দে!

( ভাবের ঘোরে টলিতে টলিতে মন্দিরের দিকে প্রস্থান )

( দুই বিপরীত দিক হইতে রাখাল ও নরেনের প্রবেশ )

নরেন। এই রাখাল, তোকে যেন দেখলাম কালীঘর থেকে বেরুতে?

রাখাল। হ্যাঁ, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম।

নরেন। বলিস্ কি? তুইও শেষে ওই আরম্ভ করলি?

রাখাল। তা কি করবো ভাই! ঠাকুর করেন, তাই আমিও করি!

নরেন। আরে ঠাকুরের ও একটা বিকার। তাই বলে, তুইও ওই মা মা আরম্ভ করলি? তুই না নিরাকারের উপাসনা করবি বলে ব্রাহ্ম খাতায় নাম লিখিয়েছিস?

রাখাল। তা ঠিক! কিন্তু ভাই, ঠাকুর বলেন, ওই মায়ের ভিতরই সব লুকানো আছে। সাকার নিরাকার সবই ওখানে!

নরেন। তুই একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেছিস্!

রাখাল। না ভাই, ভ্রান্তি নয়! তুই তো মন্দিরে যাসনে—তাই জানিসনে। ঠাকুর যখন মায়ের সামনে দাঁড়ান. আবেশে ঘর ভরে ওঠে। মাতৃ-মূর্তি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে—ভক্তিতে মায়ের পায়ে আপনি মাথা লুটিয়ে পড়ে।

নরেন। ও আবেশ-টাবেশ আমি বুঝি না। ঠাকুরই বলুন, আর যেই বলুন—যাচাই না করে আমি বিশ্বাস করবো না। আরে ধ্যাৎ, সাকার সাধন আবার সাধনা নাকি?

( রামকৃষ্ণের প্রবেশ )

রাম। যার যাতে বিশ্বাস সে তাই করুক! যা সাকার তাই নিরাকার চিত্তের মাঝে প্রেম দানা বেঁধে উঠলে সবই এক হয়ে যায়। তা তুই ওবে বাধা দিস কেন? যা তো রাখাল নহবৎখানায় বলে আয়—নরেন এসেছে

( রাখালের প্রস্থান )

দেখ নরেন, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই। যত মত—তত পথ। ব্রহ্মময় জগৎ। সবই ব্রহ্মের প্রকাশ।

নরেন। বলেন কি? তা হলে ঘটি-বাটিটাও ব্রহ্ম?

রাম। হ্যাঁ। তা, এতদিন এদিকে একবারও আসিসনি কেন রে?

নরেন। পরীক্ষার হাঙ্গামায় আর অবসর হয়ে ওঠেনি।

রাম। দেখ বাবা, ওই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে না পারলে কিছুই হবে না।

( ভাবস্থ অবস্থায় বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে নরেনের মাথায় হাত রাখিলেন )

নরেন। একি! আবার সেই পরশ! মধুর তড়িৎ প্রবাহ শিরায় শিরায়

ভুলেছে ঝঙ্কার! উর্ধ্ব হতে আরও উর্ধ্বে, অনন্ত অসীমের বুকে মন ছুটে চলেছে এক মধুর মায়ালোকে! আমি যেন—আমি যেন—

( সমাধিস্থ হইলেন )

রাম। কে তুমি?

নরেন। মহাতপা ঋষি, নররূপী নারায়ণ।

রাম। আবাস তোমার?

নরেন। দিব্যজ্যোতি ঘনতনু সমাধিস্থ সপ্তর্ষিমণ্ডল!

রাম। কেন এই নরলোকে?

নরেন। অখণ্ডের জ্যোতি-ঘনীভূত দিব্য শিশুর প্রেমভরা সুরের মায়ায়!

রাম। কে সেই দেবশিশু?

নরেন। তুমি, তুমিই সেই দেবশিশু!

রাম। কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়?

নরেন। যুগে যুগে আমি দাসানুদাস—লীলা-সহচর! গীতার প্রচার হেতু কুরুক্ষেত্রে আমিই যে অর্জুন তোমার!

রাম। এই অবতারে কি কাজ তোমার?

নরেন। সাঙ্গো হয়ে গেছে তোমার জীবনের মহাপূজা। আমি তোমার পাঞ্চজন্য। দিকে দিকে আমি বেজে যাবো—আমার কম্বুনাদে আর্ত-আতুর আসবে ছুটে তোমার পূজার বেদীমূলে। শান্তিবারি ঢেলে দেবে তুমি— পূর্ণ হবে তোমার অবতার-লীলা।

রাম। কবে ফিরে যাবে?

নরেন। কাল পূর্ণ হয়ে গেলে, আত্মপরিচয় লাভে মহাসমাধিতে ফিরে যাবো আপন মণ্ডল মাঝে।

( নরেনের বুকে রামকৃষ্ণের হস্তার্পণ )

নরেন। ( ভাবভঙ্গে ) আমি এ কোথায়? কে, কে তুমি আমায় মাঝে মাঝে

অলৌকিক মায়ালোকে নিয়ে যাও? আবার কঠিন বাস্তবের বুকে বিস্মৃতি আবরণে সব ঢেকে দাও? আমার এ ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে কেন এই খেলা ক্লান্ত আমি তোমার এ খেলায়! বলো ওগো মায়াবী, কে তুমি আমার

( রামকৃষ্ণের পদতলে বসিলেন )

রাম। ( ভাবের হাসি হাসিয়া ) আমি গুরু তোর!

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

নরেন। অবসন্ন বিবস দেহ—তবু জাগে মধু শিহরণ। মস্তিষ্ক বিকল—ত জাগে বিস্মৃতির অন্ধকারে স্মৃতির বিদ্যুৎ রেখা। গুরু! ঘুচাও অন্ধকার জ্বালাও জ্ঞানের আলো—অন্তর আমার হোক জ্যোতির্ময়।

( প্রণাম )

## চতুর্থ দৃশ্য

### ললিতের বাগান বাড়ীর প্রমোদ-কক্ষ

( ললিত, বিজয়, রমলা ও বাদকদ্বয় )

ললিত। উঃ, নরেন যেন একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে! কত কষ্টে যে আজ তাকে ধরেছি—

বিজয়। যা বলেছিস ভাই! যখনই তার ওখানে গেছি, শুনেছি সে বাড়িতে নেই। কি যে করে, কোথায় থাকে আজ-কাল!

ললিত। কি জানি? কেমনই যেন হয়ে গেছে ওটা! সে ফুর্তি নেই, উৎসাহ নেই! নরেন যে এমন হবে, তা আমি ধারণা করতে পারিনি।

বিজয়। শুনছি নাকি নরেন আজকাল সাধু হয়ে গেছে—তাই তার এসব ভাল লাগে না। ও নাকি দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল ঠাকুরের ওখানে যাতায়াত করে।

ললিত। আরে, তাই নাকি? একটা বুজরুকের পাল্লায় পড়ে নরেনটা শেষে এমন অধঃপাতে গেল?

বিজয়। সে যা খুশী হোকগে, আমার কিন্তু ভাই অত দম্ভ ভাল লাগে না। ভাল ছেলে যেন তুনিয়ায় আর কেউ নেই! এত করে বললাম, তবুও এখানে আসতেই রাজী হল না—চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকলো বাগানের ওধারে!

ললিত। ( হাসিয়া ) আচ্ছা তুই দাঁড়ানা, আজই আমি রমলাকে দিয়ে যাচাই করে নিচ্ছি—ও কতবড় শুকদেব। তুই টেনে নিয়ে আয় তো তাকে এখানে!

( বিজয়ের প্রস্থান )

দেখো রমলা, আমাদের এক বন্ধু এসেছে। তাকে যদি আজ টলাতে পারো—তবেই বুঝবো তোমার নাম-যশ !

রমলা। ( হাসিয়া ) আজ্ঞে, আপনাদের অনুগ্রহেই তো আমি আছি ! দেখা যাক্ কি হয় !

( নরেনকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বিজয়ের প্রবেশ )

নরেন। না না, আজ আমায় ছেড়ে দে ভাই ! আজ আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

বিজয়। নিকুচি করেছে তোর জরুরী কাজের ! নে, একখানা গান ধর কতদিন পরে আজ পেয়েছি তোকে ! আজ একটু বিশেষ আমোদের ব্যবস্থা আছে।

নরেন। না ভাই, গান গাইবার মত দেহ ও মনের অবস্থা আজ আমার নেই—আমায় আজ মাপ কর !

ললিত। আরে নরেন, তুই শেষে এমন হয়ে গেলি ? ওসব ডিপ্রেশন্ ঝেড়ে ফেল মন থেকে। ইট ড্রিঙ্ক এণ্ড বী মেরী ! দুনিয়ায় যতদিন আছিস—যতখানি পারিস ভোগ করে নে !

নরেন। ( স্বগত ) ক্ষুধার জ্বালা, উপবাসী মা ভাইয়ের দীর্ঘশ্বাসের জ্বালা যারা জানে না, তাদের মুখেই ও কথা সম্ভব। ( প্রকাশ্যে ) বিলাসের মাঝে বসে ও কথা ভাল লাগে—আমারও একদিন লাগতো। কিন্তু বাস্তব বড়ই নির্মম—সেখানে কল্পনার কোন ঠাঁই নেই।

বিজয়। নে নে, বাজে কথা রাখ। আজ তোকে রমলার সঙ্গে সঙ্গত করতে হবে।

নরেন। নর্তকীর সঙ্গে ? ছিঃ ছিঃ ভাই ! তোরা তো জানিস, ও পথের পথিক আমি কোনদিন নই ! ও পথে এইভাবে পয়সা নষ্ট না করে, অনেক সৎ কাজও তো জগতে করার আছে ! এ পথ ভাল নয়—এ পথ ছেড়ে দে ভাই !

বিজয়। ওঃ, তুই যে একেবারে গোঁসাই ঠাকুর হয়ে উঠলি? এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়! যে বয়সের যা! জানা আছে সব শর্মাকেই! সুযোগ পেলে সব গোঁসাই-ই মাছ ভাজা খায়।

নরেন। তা খেয়ে থাকেন—খান। তোদের আমোদে আমি বাধা দিতে চাই না। নেহাতই যদি যেতে না দিস—চুপ করে আমি বসে থাকি পিছনে!

ললিত। যাক্, আর দেরী নয়—আরম্ভ করো!

(রমলা নৃত্য সুরু করিল)

বিজয়। (মদের গ্লাস হাতে লইয়া) খা-না ভাই একটু! দেখবি প্রাণে কেমন স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটবে।

নরেন। ছিঃ, কেন আমায় এখানে জোর করে আটকে রাখলি তোরা? আমি যাই—

ললিত। (নরেনের হাত ধরিয়া টানিয়া) আরে যাবি কোথায়? মদ না খাস্—নাচটা দেখলে তো আর সাধুগিরি নষ্ট হবে না? বোস—বোস!

(নরেন চোখ বুজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল)

বিজয়। থামলে কেন? চালাও, চালাও রমলা।

(সুরু হল আবার রমলার নাচ)

(ললিত ও বিজয় রমলাকে ইশারা করিয়া চলিয়া গেল। বাদকেরাও উঠিয়া গেল সেই সঙ্গে। নাচিতে নাচিতে মোহন-ভঙ্গিতে নরেনের অতি নিকটে বসিয়া রমলা স্পর্শ করিল তাঁর কণ্ঠ।)

নরেন। (চমকিয়া চোখ খুলিয়া) একি? (বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এরা সব চলে গেছে? তা তুমি আছো কেন অমনভাবে বসে?

রমলা। (নীরব)

নরেন। এ এক পরিকল্পিত ফাঁদ! কি তোমার নাম?

রমলা। রমলা।

নরেন। আমার দিকে চোখ তুলে চাও!

রমলা। ( নতনেত্রে অবস্থান )

নরেন। বলতে পারো তোমার বাবা-মায়ের নাম ?

রমলা। না। এই পাপ-মুখে বলতে পারি না সে পবিত্র নাম।

নরেন। তা হলে তুমি জানো, এ জীবন পাপের ? এই জঘন্য জীবনে পেয়েছে কি শান্তি ? পরেও কি পাবে আশা করো ? ভেবে দেখেছো, কি তোমা পরিণাম ?

রমলা। অত্যাচার, অবিচারই আমায় ঠেলে দিয়েছে এই জীবনের পথে।

নরেন। ওই যে নবনীত সুগঠিত দেহ, উন্নত পয়োধর, যাতে সন্তান পেতে পীযুষধারা—হতো মাতৃত্বের বিকাশ—সেকি শুধু লম্পট শৃগাল-কুকুরে কামানলের আহুতি হবে ? শক্তি-অংশে তোমার জন্ম ! সীতা, সাবিত্রী তোমার আদর্শ—

রমলা। ( পদতলে পড়িয়া ) মার্জনা করুন, আমায় মাজনা করুন !

( ললিত ও বিজয়ের প্রবেশ )

বিজয়। বাহবা—বাহবা ! অভিমান, অশ্রুজল, পদতলে পতন ! বেশ জমি তুলেছিস তো নরেন ?

ললিত। বলি ব্যাপারটা কি গোঁসাই ঠাকুর ? বড় বড় নীতিকথা ব খুবই তো সাধুগিরি ফলানো হতো ! বলি বিষদাঁত ভেঙ্গেছে তো এবার

নরেন। ছি ছি—এ কি বলছিস তোরা ?

বিজয়। ভাল চাওতো এখনও আমাদের দলে ভেড়ো ! নইলে এই সাধুগিরি কথা সব জায়গায় আমরা রটিয়ে দেবো—ভেঙ্গে দেবো তোমার ভণ্ডামি।

নরেন। এত হীন, এত নীচ হয়েছিস তোরা ? রটনার কষ্ট থেকে তোদে নিষ্কৃতি দিচ্ছি আমি। আমি নিজেই প্রচার করছি—( চিৎকার করিয়া আমি মাতাল, আমি লম্পট—আমি ভণ্ড, আমি ভণ্ড।

( দ্রুত প্রস্থান )

রমলা। এই দেবতার চরিত্রে কলঙ্ক দিতে তোমাদের এই ফাঁদ ! আমি হী ঘৃণিত বেশ্যা, কিন্তু তোমরা আমার চেয়েও হীন—তোমরা পিশাচ !

## পঞ্চম দৃশ্য

### বিশ্বনাথ দত্তের বাড়ীর একটি ঘর

( চারিদিকে দারিদ্রের চিহ্ন পরিস্ফুট )

( ভুবনেশ্বরী ও নবীন )

ভুবন। দেখ নবীন, একটা কথা তোমায় না বলে আর পারছি না বাবা।

নবীন। এত সঙ্কোচ কেন মা? তোমার নব্‌নেকে কোন কথা বলতে বাধা নেই। বলো, কি বলবে?

ভুবন। কর্তার মৃত্যুর পর থেকে ক্রমে আমার সংসারের কি দশা হয়েছে—সবই তুমি জানো বাবা। এই দুঃখের সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন-সংস্থানই হয় না আমাদের। তোমার মাসিক বেতন তো আর আমি দিতে পারি না বাবা!

নবীন। ( দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ) বেতন কি আমি তোমার কাছে চেয়েছি মা?

ভুবন। না। কিন্তু তুমি না চাইলেও—আমাকে তো দিতে হবে!

নবীন। না—হবে না।

ভুবন। দু'বেলা দু'মুঠো খেতেও তো দিতে হবে!

নবীন। জুটলে দেবে—না জুটলে, তাও দিতে হবে না।

ভুবন। এমন ভাবে অকারণ কেন কষ্ট পাবে বাবা?

নবীন। অকারণ? তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছো মা! সংসারে তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এই নব্‌নে, এতটুকু বেলা থেকে তোমাদেরই অন্নে মানুষ। সে দেখেছে এই পরিবারের সুখের দিন। ভাগ্যদোষে দুর্দিন এসেছে বলেই কি নব্‌নে ভুলতে পারে সেই পুরানো কথা?

ভুবন। সবই বুঝি বাবা! কিন্তু—

নবীন। কিসের কিন্তু মা? এই নব্‌নেই যে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে বিলুভাইকে। 'তার এই দুর্দিনে কোন প্রাণে নব্‌নে ছেড়ে যাবে তাকে? ও কথা আর বলো না মা। তোমার অন্য ছেলেদের মুখে দিয়ে যদি থাকে কিছু—তবে দিও এই ছেলেটারও মুখে।

(চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান)

ভুবন। জগদীশ! অতুল সুখে সুখী করে, কোন্ পাপে আমায় এই দারিদ্রের জ্বালা দিলে? অনাহার অর্ধাহার সয়েও ছেলে-মেয়ে নিয়ে মাথা গুজবার জায়গাটুকু ছিল। এবার বুঝি তাও গেল। সবই সহ্য করেছি ঠাকুর। কিন্তু আমাদের জন্যে উপার্জনের চেষ্টায় আমার অর্ধাহারী বিলের প্রাণপাত শ্রম—তার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস যে আমি সহ্য করতে পারি না ঠাকুর!

(আঁচলে চোখ মোছেন ভুবনেশ্বরী।
পিছন হইতে নরেন প্রবেশ করে)

নরেন। মা!

ভুবন। এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাবা?

নরেন। (ম্লান হাসিয়া) রোজই যেখানে থাকি—সেখানেই ছিলাম।

ভুবন। সুবিধা হলো কিছু?

নরেন। রোজই যেমন হয়—আজও তেমনি হলো।

ভুবন। যা বাবা—আর দেরী করিসনে। স্নান করে যা হোক দুটো খেয়ে নে। কাল রাতেও তো খাসনি কিছু।

নরেন। না মা, আমি এখুনি বেরুবো! আমি আজ খাবো না—এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে আমার।

ভুবন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) এ নিমন্ত্রণের মানে আমি জান! আমাদের কুলুবে না বলে আমার বিলে আজ নিমন্ত্রণের ভান করে উপবাসী থাকে। আমার

মায়ের প্রাণ যে তার ছলনা ধরে ফেলে ! ( মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ) ~~প্রায়ই তোর~~ কোথায় এত নিমন্ত্রণ হয়রে বিলে ?

নরেন। ( হাসিয়া ) কেন্, তুমি বুঝি ভাবো আমি না খেয়ে থাকি ? না মা, প্রায়ই বন্ধুদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাকে আমার। আমার জন্যে দেরী করো না মা—তুমি খেয়ে নাও গে !

ভুবন। দেখ বিলে, একটা কথা বলবো বাবা ?

নরেন। বলো !

ভুবন। তোর বাবা বেঁচে থাকতে তোর বিয়ের যে সম্বন্ধ এসেছিল—তারা তোর আসা ছাড়েনি এখনও—প্রায়ই খবর পাঠাচ্ছে আমায়। অনেক টাকা দেবে—তাতে কষ্টের কিছু লাঘব হবে। যদি রাজী থাকিস বাবা, তবে—

নরেন। এ কি বলছো মা ! বিয়ে করে পরের টাকায় কষ্ট ঘুচাবো ? বংশ মর্যাদা, বাবার মর্যাদা, আত্ম-মর্যাদা—সবই কি টুটি টিপে মেরে ফেলবো ? এর চেয়ে দুঃখ কষ্টও যে সম্মানের মা !

ভুবন। আমি তোকে জোর করছি না বাবা ! ওরা প্রায়ই আমায় খবর পাঠাচ্ছে তাই—

নরেন। বিয়ে তো আমি করবো না বলেছি মা ! তবে আর কেন ও কথা ?

ভুবন। দুঃখের জ্বালাও ঘুচতো, আর একজন পরমাত্মীয় হতেন, তাই—

নরেন। তোমাদের কষ্ট ঘুচাতে পারছি না, এ আমার চরম অক্ষমতার কলঙ্ক ! কিন্তু এর জন্যে আমার প্রাণপাত চেষ্টার তো ত্রুটি নেই মা ? তবে আমাকে বলি দিয়েই ~~কি কষ্ট ঘুচাতে চাও মা~~ ?

ভুবন। ( জিব কাটিয়া ) না—না ! সে কি কথা বাবা ! আমি কি তাই পারি ? আমি যে তোর মা !

নরেন। আর সেই যে আমার পরম গৌরব। তোমার মত মা না পেলে

কি আজও টিকে থাকতাম! তুমি ভেবো না মা—নারায়ণ আছে তিনিই সব দেখবেন।

ভুবন। ও কথা আর বলিস নে বাবা! নারায়ণ কি আছেন? পেটে ভা জোটে না, পরনে কাপড় নেই—এবার ভদ্রাসনটুকুও যায়। নারায়ণ ে সবই করলেন!

( চলে যান ভুবনেশ্বরী। স্তব্ধ হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকে নরে

নরেন। মা যা বলে গেলেন সত্যিই কি তাই! সত্যই কি ঈশ্বর নেই মিথ্যাই কি তবে সাধকের যোগদৃষ্টি? মিথ্যাই কি দিব্যদর্শন? মিথ্যাই ি তাঁদের প্রত্যক্ষবাদ? ক্লেদ-পঙ্ক ঘেঁটে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা ছাড়া সত্যা কি মানুষের মহান উদ্দেশ্য কিছু নেই? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি তবে মিথ্যা যাবো, এক্ষুনি যাবো দক্ষিণেশ্বর। আমি প্রমাণ চাই—চাই আমি ঈশ্বর দর্শন! না পাই— ছেড়ে যাবো তাঁর পৈশাচিক লীলাক্ষেত্র এই সংসার।

( ছুটিয়া প্রস্থান )

## ষষ্ঠ দৃশ্য

## রামকৃষ্ণের ঘর

াম। মাগো, সবাই আসে কিন্তু সে কেন আর আসে না মা? কতদিন তাকে দেখিনি। আর যে আমি পারি না! ওরে আয়—আয়!

( টলিতে টলিতে গিরিশের প্রবেশ )

িরীশ। এই যে বাবা, এখানে বসে আছো! বলি, বেশ তো জাঁকিয়ে গুরুগিরি স্বরু করেছো —আর যত সব কচি ছোঁড়ার মাথা খাচ্ছো।

াম। তাহলে তুমি এতদিনে এলে? এস, এস,—

িরীশ। আসবো না? রাসমণির বাগানে এক আজব চীজ্ এসে রয়েছে, কত লোক দেখতে আসে—আর আমি আসবো না? বলি, তুমি নাকি কত কি বুজরুকি করো? মা কালীর সঙ্গে কথা বলো?

ম। কে বলে একথা?

রীশ। কত শালা বলে! সব শালা বেকুব, তাই তোমার বুজরুকিতে ভোলে। তাই তো একবার দেখতে এলাম যে, তুমি শালা কত বড বুজরুক—আর আমি শালা কেমন গিরীশ ঘোষ! চেনো আমাকে? আমি নাটুকে গিরীশ—মদ খাই বেশ্যা নিয়ে থিয়েটার করি।

ম। তুমি দাঁডাতে পারছো না! বসো, বসো—তুমি তো এখনও মদে চুর হয়ে আছো।

রীশ। আছি তো আছি—বেশ করেছি! তাতে তোমার কি শালা? তোমার বাবার পয়সায় মদ খাই? কোন শালার তোয়াক্কা রাখে না গিরীশ ঘোষ! আবার খাবো মদ!

( পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া মদ্যপান )

রাম। তা খাও। কিন্তু খাবার আগে ভগবানের নাম করে খেলেই পারো ?

গিরীশ। কেন ? তিনি আবার কোথাকার কে ? যার কোন খোঁজ খব নেই, ঠিক ঠিকানা নেই—তার নাম করতে আবার যাবো কেন ?

রাম। তাহলে নেশাটা জমে ভাল ! কারণ তিনিও মদ খান কিনা ?

গিরীশ। তুমি শালা সে খবরটা কি করে জানলে ? আমি শালা কি তোমা মত বেকুব, না কচি ছেলে যে, যা বলবে তাই বিশ্বাস করবো ?

রাম। তিনি যদি মদই না খাবেন, তবে উল্‌টো পালটা এই জগতটাকে কি করে সৃষ্টি করলেন ?

গিরীশ। এ্যাঃ—( ভাবিয়া ) হুঁ, এতক্ষণে শালা একটা কথার মত কথা বলেছে ঠিক, মদ না খেলে এমন জগতটাকে কেমন করে তৈরী করলেন ? ভাববা কথা ! বুকের জ্বালা নেভাতে মদ খাই—কিন্তু তাতে জ্বালা আরো বাড়ে ভগবান যদি মদ খান, তবে তাঁর বুকেও কি জ্বালা আছে ?

রাম। নিশ্চয়ই আছে। তাঁর সব মাতাল ছেলেদের জন্যে তাঁর বুকে কত জ্বালা !

গিরীশ। হুঁ। তুমি তো অনেক তুক্‌-তাক্‌ জানো। এই মনের জ্বালা কিসে যায় বলতে পারো ?

রাম। বাবা, তুমি আত্মবিকৃতি রোগে ভুগছো !

গিরীশ। ওঃ—বাবা ! এযে কবিরাজী সুরু করলো ! শালা নিজে ভুগছে মস্তিষ্ক বিকৃতিতে—আবার আমায় বলে কিনা আত্মবিকৃতি ?

( মদ্যপান )

উঃ, বুকটা জ্বলে গেল, তবুও প্রাণের জ্বালা গেল না।

রাম। আমি পারি তোমার ও জ্বালা নেভাতে !

গিরীশ। পারো, পারো—দাও তা হলে নিভিয়ে !

রাম। ভগবানের ধ্যান করো—জ্বালা জুড়াবে।

গিরীশ। ওঃ—বাবা! তার চেয়ে আত্মহত্যা করা আমার কাছে সহজ।

রাম। আচ্ছা, বেশী না পারো—খাবার আগে, আর শোবার আগে একবার করে ভগবানের নাম করো!

গিরীশ। নাঃ, ও আমার দ্বারা হবে না। নিয়ম মানতে আমি পারবো না। ভগবানের কথা ভাববার সময়ই আমার নেই!

রাম। বেশ, তাও যদি না পারো তবে প্রতিনিধি দিয়েই কাজ চালাও!

গিরীশ। শালা পাগল বলে কি? একি ছেলে মেয়ের বিয়ে যে, প্রতিনিধি দিয়ে কাজ করাবো? শালা পুরুতের বাচ্চা, তাই ভগবানকেও প্রতিনিধি দিয়ে ডাকাতে চায়! কিন্তু এমন অভিনব কথাতো আর কেউ বলেনি! সত্যিই কি এ পাগল! সত্যিই বলছো প্রতিনিধি দিয়ে ভগবানকে ডাকালে কাজ হয়?

রাম। কেন হবে না? তুমি যদি মনপ্রাণে তার হাতে ভার ছেড়ে দাও, তবে নিশ্চয়ই হয়।

গিরীশ। কিন্তু কোথায় পাবো আমি এমন প্রতিনিধি?

রাম। কেন, আমার উপর তুমি ছেড়ে দাও তোমার ভার!

গিরীশ। হবে, হবে তুমি আমায় প্রতিনিধি? মাতাল, বেশ্যাসক্ত, যার দিকে তাকাতে লোকে ঘৃণাবোধ করে—নেবে তুমি তার ভার?

রাম। নেবো, যদি তুমি মনেপ্রাণে দাও!

গিরীশ। আমি মাতাল—ঘৃণিত! আমি করেছি তোমাকে অপমান—প্রতিদানে তুমি করেছো আমার কল্যাণ কামনা। তুমি সাধারণ পাগল নও! এই আমি তোমায় করলাম প্রণাম। আমার অপরাধ মার্জনা করো! মনে প্রাণে আমার সব ভার তুলে দিলাম তোমার হাতে। তোমার নিশ্চয় কোন শক্তি আছে! আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আর আমি থাকবো না এখানে। দিয়ে গেলাম আমার সব তোমার পায়ে ফেলে।

কিন্তু সাবধান ঠাকুর! মনে রেখো আমি মাতাল গিরীশ—আমার কাজ যদি না হয় ঠিক মত—আমি আবার আসবো, দেখে নেবো তোমাকে।

(প্রস্থান)

রাম। ভৈরব, গিরীশ আমার ভৈরব! ষোলোর উপর আঠারো আনা ওর বিশ্বাস। ওই জোরেই কেটে যাবে সব ক্লেদ। সবই তো এলো, কিন্তু নরেন কেন আসে না আর? ~~বুকের ভিতরটা যেন কেমন করছে~~!

(লাটুর প্রবেশ)

রাম। কিরে লেটো, নরেনের খোঁজ পেলি?

লাটু। হাঁ বাবা

রাম। কেন আসে নারে? ভাল আছে তো?

লাটু। নেহি বাবা, লরেন ভাইয়া ভাল নেই। বোড়ো কষ্টে আছে। উস্‌কে পিতাজী মারা গিয়েছে। আওর যত সব দোস্ত, সব দুশমন হোকে লরেন ভাইয়াকে ফাঁকি দিয়েছে।

রাম। তাই নাকি? তবে তো নরেনের বড়ই বিপদ! ছেলেমানুষ বড়ই দুঃখ পেয়েছে। যাবো, আমি নিজে যাব তার কাছে। চল লেটো, আমায় নিয়ে চল সেখানে।

লাটু। আপনি বেস্তো হোবেন না বাবা। লরেন ভাইয়াকে মিলবে না আদালতে সে মামলা লড়তে গিয়েছে।

রাম। হবে না, ও সব মামলায় কিচ্ছু হবে না। আমার নরেনের এই বিপদ! কি করি, আমি এখন কি করি?

লাটু। ওবস্থা এমন হইয়েছে যে, দুবেলা খানাপিনা ঠিকছে মিলছে না।

রাম। না না, আর আমি শুনতে পারি না। ওরে আমি ভিক্ষায় বেরুবো—নরেনের জন্যে নিজে আমি ভিক্ষায় বেরুবো!

লাটু। বেস্তো হোবেন না বাবা! আপনি ভিখ্ মাঙলে, নরেন ভাইয়ার মাথা হেঁট হোবে।

রাম। ওঃ তাই তো, নরেনের আমার মাথা হেঁট হবে! আচ্ছা, আচ্ছা তুই যা লেটো—আমায় ভাবতে হবে, ভাবতে হবে!

(লাটুর প্রস্থান)

মা, মাগো, এর উপায় বলে দে মা! এমন একটা অমূল্য সম্পদ এমনি করে নিঃশেষ হয়ে যাবে? মা, মাগো—

(নরেনের প্রবেশ)

নরেন। (ব্যঙ্গভরে) মা, মাগো! কোথায় এই মা? কোথায় নারায়ণ? কোথায় ঈশ্বর আমি দেখতে চাই! আমি জানতে চা· এই বিশ্ব নিয়ে কেন তাঁর এই ছেলেখেলা? ঈশ্বর যদি জগতের পিতা, তবে কেন এই ভেদ? কেন এই পক্ষপাত? একদিকে দারিদ্রের হাহাকার, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস—অন্যদিকে স্বাচ্ছন্দের বিলাস, অফুরন্ত আনন্দের ধারা! কেন এই বৈষম্য? ঈশ্বর নেই। থাকলে, তাঁর এই দানবী সৃষ্টির পৈশাচিক রূপ দেখে, নিজেই তিনি শিউরে উঠতেন। না—ঈশ্বর নেই। এ শুধু দুর্বলের অলীক সান্ত্বনা!

রাম। আয়, আয় নরেন। কি বললি বাবা, ঈশ্বর নেই?

নরেন। না ঈশ্বর নেই!

রাম। ছিঃ নরেন! তুই এই কথা বললি বাবা! তুই নিজে উপলব্ধি—

নরেন। না না, আর আমি বিশ্বাস করি না! আপনার প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ওটা আমার চিত্তের সাময়িক দুর্বলতা। ঈশ্বর থাকলেও তিনি অতি নগণ্য দুর্বল। দু'মুঠো অন্ন দিয়ে যিনি বাঁচাতে পারেন না—কিসে তিনি সর্বশক্তিমান? কি হবে আমার এই দুর্বল ঈশ্বর লাভে? ঈশ্বর কল্পনা মাত্র। আপনি প্রমাণ দিতে পারেন ঈশ্বর আছেন?

রাম। প্রমাণ? প্রতিনিয়ত যাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করি, সর্বভূতে যে সত্য স্বপ্রকাশ—তাঁকে আবার প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে? না বাবা—তা আমি পারবো না।

নরেন। তা হলে উপায়? কে তবে আমায় নিঃসন্দেহ করে দেবে? কে জুড়াবে আমার প্রাণের জ্বালা? না হলো আমার মা-ভাইয়ের দু'মুঠো অন্ন-সংস্থান—না হলো আমার ঈশ্বর-লাভ। কেন তবে এই সংসারে থাকা? (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর আমি সংসার ছেড়ে যাবো!

রাম। জানি তুই মায়ের কাজে এসেছিস—সংসারে থাকতে পাবি না। তবু যতদিন আমি আছি—থাক!

নরেন। জননীর বিরস বদন আর আমি সহ্য করতে পারি না ঠাকুর! ভাই-বোনের অনাহার-ক্লিষ্ট-মুখ, বুকে আমার দাবানল জ্বেলে দেয়—আমায় বিশ্বাসহারা করে তোলে। উঃ বড় কষ্ট ঠাকুর, বড় কষ্ট!

রাম। জানিরে নরেন—আমি সবই জানি! বড় কষ্ট! একটা জিনিস নিবি? সাধনকালে আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। তা আমার কোন কাজে লাগেনি—তুই নিবি?

নরেন। তাতে কি আমার ঈশ্বর লাভের উপায় হবে?

রাম। না। তবে পার্থিব কোন দুঃখ কষ্টই আর থাকবে না।

নরেন। তবে ওতে কোন প্রয়োজন নেই আমার। ঠাকুর, মাকে বলে আমার মা ভাইয়ের দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা আপনি করে দিন! এই মর্মজ্বালা থেকে আমায় বাঁচান!

রাম। কিন্তু তা কি করে হবে রে? তুই যে মাকে বিশ্বাসই করিস না?

নরেন। আমার এই দুঃখের উপর, আর আমায় বিদ্রূপ করবেন না ঠাকুর!

রাম। বিদ্রূপ! ছিঃ বাবা, তোর জন্যে আমি নিজে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।

নরেন। তবে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন!

রাম। তা—মা তো তোমারও মা! তুই নিজে অভাব জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে উপায় চেয়ে নিয়ে আয়!

নরেন। সে কি করে হবে? মাকে আমি কোথায় পাবো?

রাম। কেন, মন্দিরে?

নরেন। আপনার ভক্তি আছে, কিন্তু আমার তো তা নেই! আমি কি করে মাকে পাবো?

রাম। আছে, নরেন সবই আছে! ভক্তিভরে একবার যদি মা বলে ডাকতে পারিস—পাবি মাকে!

নরেন। পাবো, পাবো, মাকে পাবো?

রাম। তুই মন্দিরে যা, আমি বলছি তুই মাকে পাবি।

নরেন। যাবো মন্দিরে। আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই পাবো মাকে। টাকা, আমার চাই। উপবাসী মায়ের মুখ নীরব ভর্ৎসনায় যেন বলে—ওরে ব্যর্থ, ওরে কাপুরুষ, তুই অপদার্থ সন্তান আমার! অনাহারী ভাই-বোন নীরব অশ্রুভরা চোখে যেন বলে—না না, টাকা, টাকা আমার চাই!

( প্রস্থান )

ম। মা, মাগো, নরেন যে বাগ মানে না! আজ তার সব ভুল ভেঙ্গে দে মা! বিস্মৃতির আবরণ তুলে দিয়ে, তার চৈতন্য জাগ্রত করে হৃদয় আলো করে দাঁড়া মা! মা, মাগো, ও যে টাকাকড়ি চায়? তা হলে উপায়? নরেনও কি কামিনী-কাঞ্চনের মোহে সংসার-পঙ্কে চিরান্ধকারে ডুবে যাবে? তার অন্তরে শুভ-প্রার্থনা জাগিয়ে তার বাসনা পূর্ণ করিস্ মা! ~~তা না হলে~~ যে ~~সব মিথ্যা হয়ে যাবে। নরেন যদি ডুবে যায়—তবে রামকৃষ্ণ যে ভেসে যাবে!~~

## মঞ্চ ঘুরিয়া গেল

### মন্দির-দ্বার

নরেন। টাকা, টাকা, টাকা আমার চাই! ইহকালের কোন কর্তব্যই যদি পালন করতে না পারি—তবে কি হবে আমার পরকালে? টাকা, টাকা আমার চাই। মা, মাগো পাষাণী! আমার চোখে যে তুই চির জড়-পাষাণ! নেই কি এই পাষাণের অন্তরালে তোর কোন চিন্ময়ী রূপ? জীবনে তো মা বলে একবারও ডাকিনি তোকে! আজ সকাতরে ভক্তিভরে ডাকি—মা, মাগো চিন্ময়ী, দেখা দে—একবার দেখা দে মা!

( আলোক-রশ্মির ভিতর মাতৃ-মূর্তির আবির্ভাব )

সর্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥

ওরে হীন, ওরে কাঙ্গাল, পলকে যাঁর পায়ে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় হয়ে যায়, সেই জগদীশ্বরীর সন্তান হয়ে, কাঁচের মোহে তুই কাঞ্চন ফেলে দিবি? ওরে মূঢ়, জীবনের শুভলগ্ন ওই বয়ে যায়!

( নতজানু হইয়া )

ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও মা! আমায় জ্ঞান দাও, বিবেক দাও—বৈরাগ্য দাও!

( রামকৃষ্ণের প্রবেশ )

রাম। কিরে নরেন, মাকে পেয়েছিস?

নরেন। হ্যাঁ ঠাকুর, আপনার কৃপায় আজ আমি ধন্য। আজ আমার মত ভাগ্যবান কে?

( প্রণাম )

রাম। বেশ, বেশ! তা মার কাছে কি চাইলি?

নরেন। মার কাছে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য প্রার্থনা করলাম। তথাস্তু বলে মা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন।

রাম। কিন্তু, টাকা কড়ির কি করলি ?

নরেন। হলো না ঠাকুর! টাকাকড়ির প্রার্থনা বিস্মৃত হয়ে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য প্রার্থনা করলাম।

রাম। নরেন, তা হলে সত্যিই তোর অদৃষ্টে টাকাকড়ি নেই!

নরেন। ঠাকুর, তা হলে কি আমার মা ভাইয়ের দু'মুঠো অন্ন জুটবে না ?

রাম। আচ্ছা, তুই অত ভাবিসনে! আমি আশীর্বাদ করছি—তোর মা ভাইয়ের ডাল-ভাতের অভাব হবে না।

নরেন। আঃ, এইবার আমি নিশ্চিন্ত! যাই মাকে এই শুভসংবাদ দিয়ে আসি!

(প্রস্থান)

রাম। (হাসিয়া) নরেন যাবি কোথা তুই! যা দিকি এবার কোথায় যাবি ? (প্রাণখোলা হাসি)। (ত্রস্ত হইয়া) কিন্তু মা, ঢেকে ফেল—ঢেকে ফেল! তোর মায়াশক্তি দিয়ে নরেনকে ঢেকে ফেল! নইলে যে ওর দ্বারা কোন কাজ হবে না মা ; ওযে অকালে চলে যাবে!

## সপ্তম দৃশ্য

## কাশীপুরের বাগানবাড়ীর ঘর

শয্যায় শায়িত অসুস্থ রামকৃষ্ণ। পাশে বসিয়া সেবারত কালী।

( বুড়ো গোপালের প্রবেশ )

গোপাল। বাবা, নরেন কেমন হয়ে গেছে! সে তার হাত পা খুঁজে পাচ্ছে না!

কালী। সেকি গোপালদা! সে আবার কি?

রাম। ( নীরবে মৃদু হাস্য )

গোপাল। কি জানি ভাই! দেখলাম ধ্যান করছে! হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—গোপালদা আমার হাত-পা কোথায় গেল? ছুটে গিয়ে বললাম—এই তো তোর হাত-পা। সে বলে—কিছুই নেই, মাথাটা আছে! কথা জড়িয়ে গেছে। একি হলো বাবা?

রাম। বেশ হয়েছে। থাক্ কিছুক্ষণ অমনি পড়ে। ( হাসিয়া ) আমাকে কি ওর জন্যে কম জালিয়েছে! ওর জন্যে ব্যস্ত হয়ো না তোমরা! গোপাল, তোর সেই গেরুয়া কি হলো?

গোপাল। সে তো সব কেনাই আছে বাবা!

রাম। যা, তা হলে নিয়ে আয় সাধুদের দান করবি!

( গোপালের প্রস্থান )

কালী। সাধু কোথায় বাবা?

রাম। এখানেই সব আছে।

( নরেনের প্রবেশ )

এই যে নরেন আয়! এ তুই করলি কি বলতো? না জমতেই খরচ?

(গোপালের গেরুয়া লইয়া প্রবেশ ও রামকৃষ্ণের পদতলে স্থাপন)

গোপাল। এই যে বাবা, গেরুয়া!

রাম। এদিকে আয় নরেন!

( নরেনের তথা করণ )

সবাইকে একখানা করে গেরুয়া দিস্! আর গিরীশকেও একখানা দিস্।

কালী। আজ্ঞে গিরীশকেও?

রাম। হ্যাঁ তাকেও একখানা দিস্!

কালী। কিন্তু সে যেমন কদাচার করে বেড়ায়—মদ খায়?

রাম। তা খায়! কিন্তু আগে আমাকে নিবেদন করে তবে খায়! তার কদাচারটাই দেখলি—ভক্তি দেখলি না? আজ থেকে সবাই তোরা সন্ন্যাসী। যা সবাই আজ ভিক্ষা করে এনে রেঁধে খা।

কালী ও গোপাল। নারায়ণ হরি, নারায়ণ হরি!

( উভয়ের প্রস্থান )

রাম। কিরে নরেন, যা চেয়েছিলি—তা তো পেয়েছিস! মা তো আজ সবই দেখিয়ে দিলেন! কিন্তু এখন আর না! সবই চাবি বন্ধ থাকলো। কাজ শেষ হলে তবে খুলবো। যা এখন কর্মস্রোতে ভেসে যা। জগতে তোকে লোক-শিক্ষা দিতে হবে।

নরেন। না না, মার্জনা করো গুরু! আমার যে চাওয়া-পাওয়ার অনেক বাকী!

রাম। সেকি রে! যা পেয়েছিস্ সেই তো পরম পাওয়া।

নরেন। না না, আমি কর্ম চাই না, মুক্তি চাই না—চাই শান্তি! আমি চাই শুকদেবের মত ক্রমাগত সমাধির চিরানন্দে ডুবে থাকতে!

রাম। ছিঃ নরেন! তুই এত বড় আধার, তোর মুখে কি মানায় এই স্বার্থপরের কথা? শুধু নিজের মুক্তির আনন্দে তুই ডুবে থাকতে চাস্?

মা জগদম্বার ইচ্ছায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী তোকেই জগতে প্রচার করতে হবে!

নরেন। মার্জনা করো ঠাকুর! পারবো না আমি তোমার এ আদেশ পালন করতে।

রাম। তোকে পারতেই হবে! জগদম্বা তোকে ঘাড়ে ধরে করিয়ে নেবেন। আমার লীলা অবসান হয়ে এলো। আমার ছেলেরা সব রইলো—তাদের ঠিক পথে চালাস!

নরেন। কিন্তু আপনি গেলে আমার কি উপায় হবে?

রাম। ভাবনা কেন? আমার কি মৃত্যু আছে? আমার মৃত্যু নেই—মুক্তি নেই! আমি তোরই মাঝে বেঁচে থাকবো!

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

নরেন। একটি সন্দেহের সমাধান তো এখনও হলো না। অনেকেরই বিশ্বাস ঠাকুর অবতার! সত্যই কি তাই?

রাম। কিরে নরেন, এখনও সন্দেহ গেল না? (হাসিয়া) যে রাম সেই কৃষ্ণ, সেই আবার এই আধারে শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেন। ঠাকুর কি করে জানলেন আমার মনের কথা? সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার! যুগে যুগে যে শক্তি ধরার বুকে অবতীর্ণ হন—সেই বিচিত্র ভাবধারার সমন্বয় রূপই এই শ্রীরামকৃষ্ণ! অবতার, সত্যই অবতার এই শ্রীরামকৃষ্ণ!

রাম। কিরে সন্দেহ গেল!

নরেন। ঠাকুর পুত্র বলে ক্ষমা করো অপরাধ! আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে কেমন করে হবে তোমার আদেশ পালন?

রাম। শক্তি! মায়ের ইচ্ছায় মহাশক্তি জাগ্রত হবে তোর মাঝে। মায়ের কাছে মায়ের কাজে তুই বলি প্রদত্ত! আমায় তুলে দেতো নরেন!

( নরেন রামকৃষ্ণকে তুলিয়া বসাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার বুকে হাত দিয়া সমাধিস্থ হইলেন )

নরেন। তড়িৎ কম্পনের মত অপরূপ তেজরাশি আমার দেহে লীন হয়ে গেল। সসীমের বুকে জাগে অসীমের অনুভূতি। মানসমুকুরে পড়ে বিরাটের ছায়া! হৃদয়-কন্দর হতে ওঠে অমৃত অভয়বাণী। চোখে জাগে নবীন স্বপন, বুকে জাগে অফুরন্ত আশা—ধমনিতে বয়ে যায় শক্তির প্রবাহ! শক্তি, শক্তি, কোথায় শক্তি? শক্তিধর আমি আজ। যে অমরত্ব, যে অভয়-বাণী পেয়েছি আজ, আর্ত-আতুর ভাই-ভগ্নীর বুকে দিতে হবে তার অমৃত পরশ! ঠাকুর জ্বালাও অন্তরে জ্ঞানের আলো, দাঁড়াও আমার নয়নের আগে—হাত ধরে নিয়ে চলো বিশ্বজয়ের পথে। শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং, শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং, শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্!

( প্রণাম )

# বিকাশ

## প্রথম দৃশ্য

### গাজীপুর তাড়িঘাট রেল-স্টেশন

( একধারে একটি লোক তামাক টানিতেছে )

( বেনের প্রবেশ )

বেনে। ভণ্ড, যত শালা ভণ্ড গেরুয়া পরে সাধু সাজেন ! যত সব কুঁড়ের বাদশ গতর থাকতে খেটে খাবার ভয়ে সাধু সেজে পরের ঘাড় ভেঙ্গে আরা থাকে। চোর, চোর—শালারা চোর ! দিনে সাধু সেজে থাকে—সুযো পেলেই রাতে শালারা করে চুরি। ইদিকে আবার গ্যাট্ ম্যাট্ ইংরা বুকনী আছে ! শালা টিকটিকি পুলিশ নয় তো ? যা দিনকাল পড়েছে- বলা যায় না কোন্ শালা কি ! মরুকগে শালা ! যাই নিয়ে আ কিছু খাবার !

( প্রস্থান )

( স্বামিজীর প্রবেশ )

স্বামিজী। যাবো, যাবো আমি নগরে নগরে—প্রতি জনপদে ! যাবো আ সুজলা সুফলা শ্যামলীর কোলে, হিম-কঠিন শৈলশিখরে, ভ্রূকুটি কুটিল মরু বুকে—স্নিগ্ধ সুনীল সাগর-বেলায়। ডাকে বাংলা, ডাকে হিমাদ্রি রাজপুতনার মরুবুক হতে ভেসে আসে ডাক ! ডাকে, ডাকে সাগরি কন্যাকুমারিকা। জন্ম থেকে আমি মায়ের কাছে মায়ের কাজে বলি প্রদত্ত হে মাতঃ বিশ্বজননী ! আশীর্বাদ করো মা, গুরু নির্দিষ্ট পথে আত্মবলিদা যেন ধন্য হতে পারি।

( ক্লান্তভাবে লোকটির পাশে উপবেশন। লোকটি স বসলো একটু দূরে )

স্বামিজী। ওকি সরে গেলে কেন ভাই?

ভঙ্গী। আপনি সাধুবাবা আছেন!

স্বামিজী। তাতে কি? তোমার ছিলিমটা একটু দেবে ভাই? আমি বড়ই ক্লান্ত।

ভঙ্গী। সাধুবাবা, আমি ভঙ্গী আছি!

স্বামিজী। ও, মেথোর—ছিঃ! ছিঃ? কেন ঘৃণা আমার মনে? ভঙ্গী বলে কি লোকটা মানুষ নয়? জীব আর শিবই না আমার কাছে সমান? শিব জ্ঞানে জীবের সেবাই না আমার ধর্ম? কোথায় তবে ধর্ম আর কর্মের সমন্বয়? দাও তো ভাই তোমার ছিলিমটা?

ভঙ্গী। সাধুবাবা, আপনি মহারাজ—আর আমি ছোট জাত আছি!

স্বামিজী। তুমি আমার গুরু আছো! তুমি আমি একজাত—আমরা মানুষ!

(ছিলিম লইয়া তামাক টানিয়া ভঙ্গীর হাতে প্রত্যর্পণ)

ভঙ্গী। এ সাধুবাবা মানুষ নয়—দেবতা আছে!

(প্রস্থান)

স্বামিজী। যত জীব তত শিব। শিবময় জগৎ।

(বেনের প্রবেশ—হাতে খাবারের ঠোঙ্গা ও জলের ভাঁড়)

বেনে। ওঃ বাবা! এখানেও হাজির হয়েছো? মনে করলাম পাপ বিদায় হয়েছে!

স্বামিজী। কেন, আমি আপনার কোন অসুবিধা করছি?

বেনে। না না, অসুবিধা তুমি আর কি করতে পারো? তোমার তো এক কানাকড়িও মুরোদ নেই! তা নয়—তোমাদের এই গেরুয়াপরা জাতটাকে দেখলেই আমার গা জলে যায়!

স্বামিজী। তাঁদের অপরাধ?

বেনে। তারা ফাঁকি দিয়ে পরের ঘাড় ভেঙ্গে খায়। পরের খেয়ে দেহটা কিন্তু তুমি বেশ নধর করেছো !

স্বামিজী। কিন্তু আপনার তো কিছু নিইনি ? আপনি তো একটু জলও তখন দিলেন না আমায় !

বেনে। কেন দেবো ? বাবা, আমি বেনের বাচ্চা ! ও সব দান-ধ্যান আমি বুঝি না। আমি জানি পয়সা রোজগারের কষ্ট ! এই দেখো কেমন গরম পুরি আর খোয়ার প্যাড়া ! কি আরামে এই খাই দেখো ! আমি কষ্ট করে রোজগার করি—তাই আরামে আছি। আর তুমি হাত-পা থাকতেও খাটতে নারাজ—তাই না খেয়ে পড়ে আছো। বলো তো, এই পেড়াগুলো মুখের ভিতর আমায় কেমন আরাম দিচ্ছে ?

স্বামিজী। কেন আপনি ওসব বলছেন ? আমি কি আপনার পেড়া চেয়েছি ?

বেনে। আরে বাবা, চাইলেই কি আমি দিই ? তা নয় ! তুমি শুধু দেখো, পয়সার কি ক্ষমতা ! পয়সা রোজগারের ফলও দেখো—আর সন্ন্যাসী হওয়ার ফলও দেখো ! ( জল খাইয়া ) আ-হা- ! এই জল কি ঠাণ্ডা—যেন বরফ !

( খাবারের ঠোঙা ও জলের ভাঁড় হাতে লইয়া হালুইকারের প্রবেশ )

হালুইকার। আরে বাবা, ঠেলে তো ভুললি ! কিন্তু কাকে আমি এসব দিই ? এই যে একজন সন্ন্যাসী বসে ! এ তল্লাটে আর কোন সন্ন্যাসী যখন নেই—তখন ইনিই হবেন ! এই যে সাধুবাবা ! আমি খাবার আর জল এনেছি ! দয়া করে এইটুকু খেয়ে আপনি সুস্থ হোন।

স্বামিজী। নারায়ণ, নারায়ণ ! দু'দিন আমি অনাহারী !

( খাবার লইয়া খাইতে সুরু )

বেনে। ওহে, খুব তো খাতির করে খাওয়াচ্ছো। বলি, দাম পাবে আশা করো ? ট্যাক তো ওদিকে একেবারে খালি—দু' ঘা দিলেও একটা আধলাও বেরুবে না !

ালুইকার। ছিঃ, ছিঃ! এ আপনি বলছেন কি? আমি সাধু সেবা করছি! আহাহা! এমনটি আমার জীবনে কখনও হয়নি। মহাভাগ্য আমার, তাই এই সাধু-সেবা করতে পেলাম!

বনে। সাধু কোথায় গো! যত সব ভণ্ড।

ালুইকার। আরে আপনি থামুন মশায়? জানেন না তো সে ঘটনা! শুনলে আপনিও থ' হয়ে যাবেন।

বনে। ব্যাপারটা কি বলতো হে।

ালুইকার। আমি একজন হালুইকার। দোকানের ঝাঁপ ফেলে একটু ঘুমিয়েছি অমনি স্বপ্নে দেখি—এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমায় ঠেলে তুলে বলছেন, ওঠ ওঠ, আমার ভক্ত সাধু অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে—শিগ্‌গীর গিয়ে তার সেবা কর। স্বপ্ন মনে করে যেই আবার ঘুমিয়েছি, আমায় ঠেলে তুলে সন্ন্যাসী বলে—ভক্ত কি আমার অনাহারে মরবে? এখুনি গিয়ে তাকে খাইয়ে আয়! এখনও আমার কানে বাজছে সেই কথা। আহা, আমি আজ ধন্য হলাম। পেট ভরেছে সাধুবাবা?

ামিজী। হ্যাঁ ভাই, খুব খেয়েছি—আবার দু'দিন চলবে। আমি ভাই তাহলে এবার আমার পথে যাই?

ালুইকর। (প্রণাম করিয়া) আমায় আশীর্বাদ করুন সাধুবাবা!

ামিজী। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন ভাই! মানুষকে ঘৃণা করো না। শিবজ্ঞানে জীবকে ভালবেসো।

(হালুইকরের প্রস্থান)

কে বলে আমি একা। নারায়ণ, তুমি যে আমার সাথে সাথে আছো প্রভু। আমি যে তোমারই জন্যে ভিখারী—তাই তো প্রভু আমার জন্যে ভিক্ষা করো তুমি। ভগবান! তুমি সত্য, তুমি সত্য—তুমি সত্য।

(প্রস্থান)

বেনে। অবাক কাণ্ড। এ আমি করেছি কি? এমন সাধুপুরুষকে বলেছি এমন কটু কথা! মহাপাপ করেছি আমি! এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পায়ে ধরে মার্জনা চাইতে হবে! যেমন করেই হোক সাধুবাবাকে ধরতে হবে—ধরতে হবে।

(দ্রুত প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### আলোয়ার রাজবাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষ

(রামচন্দ্রজী ও মৌলবী সাহেব)

রাম। মহাপুরুষ! স্বামিজী নিশ্চয়ই ঈশ্বর দর্শন পেয়েছেন। নতুবা, আমরাও তো তাঁকে ডাকি, কিন্তু আমাদের তো এমন তন্ময়ভাব হয় না!

মৌলবী। এইটুকুই তো ঈশ্বরের বিভূতি! ইনি নিশ্চয় ঈশ্বর লাভ করেছেন। স্বামিজীর হৃদয় আনন্দে ভরপুর—মুখে হাসি লেগেই আছে।

রাম। মৌলবী সাহেব, এমন সুন্দর শ্লোকপাঠ আর কখনও শুনিনি। কণ্ঠে যেন রূপোর তার বাজে।

। হ্যাঁ, ওঁর কণ্ঠে নাদ আছে। আর কি অগাধ পাণ্ডিত্য! হিন্দু-মুসলমান সবাইকেই কেমন সুন্দর উপদেশ দেন! ভাগবৎ ও কোরানের কি সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। কোরানের বাণীর এমন হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা, কোন মুসলমানের মুখেও আমি আর শুনিনি।

রাম। শুধু তাই নয়! ওর কণ্ঠে এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে যে, শুনলেই মুগ্ধ হতে হয়।

। আর দেখেছেন প্রকৃতিটি কি মধুর? এত লোক বিরক্ত করছে, আহাম্মকের মত যা তা প্রশ্ন করছে—তাতে একটুও রাগ নেই!

াম। দেখুন মৌলবী সাহেব, মহারাজ হয়তো এখুনি এসে পড়তে পারেন। তাঁর যে রকম ইংরাজী ভাবাপন্ন মতিগতি হয়েছে, আর সেই সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলেছে—তাতে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। স্বামিজীর প্রভাবে তাঁর মতিগতির পরিবর্তন হতে পারে মনে করে, আমি স্বামিজীকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি।

মৌলবী। ঠিকই করেছেন পণ্ডিতজী! এমন মহাপুরুষের প্রভাবে মানুষের জীবনের গতি বদলে যাওয়া খুবই সম্ভব।

( স্বামিজীর প্রবেশ। রামচন্দ্র ও মৌলবীর অভিবাদন )

রাম। আসুন, আসুন স্বামিজী! আমাদের মহারাজ আজ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। স্বামিজী, আপনার উপদেশ প্রভাবে তাঁর ইংরাজী ভাবাপন্ন মতিগতির যদি কিছু পরিবর্তন হয়—তবে, আমরা সমস্ত আলোয়ারবাসী প্রজাবৃন্দ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

স্বামিজী। আমি কি করতে পারি পণ্ডিতজী! সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা—আমি তাঁর দাসানুদাস।

( মহারাজের প্রবেশ। রামচন্দ্র ও মৌলবীর অভিবাদন )

রাম। আসুন, আসুন মহারাজ! ইনি আলোয়ার অধিপতি। আর ইনি মহাপণ্ডিত সিদ্ধপুরুষ সন্ন্যাসী।

( মহারাজের অভিবাদন ও স্বামীজীর আশীর্বাদ )

মহারাজ। স্বামিজী, আমি এ রাজ্যের রাজা! কিন্তু আমার প্রাপ্য সম্মান তো আপনি দিলেন না?

স্বামিজী। সম্মান মানে তো অভিবাদন? কিন্তু মহারাজ, আমিতো কোন রাজার প্রজা নই! এই বিশ্বরাজ্যের যে রাজা, তাঁরই প্রজা আমি— তাঁকেই শুধু অভিবাদন করি। আমি সন্ন্যাসী, জীবকল্যাণই আমার ধর্ম। আপনার কল্যাণ কামনা আমি করেছি মহারাজ।

মহারাজ। আচ্ছা স্বামিজী, শুনেছি আপনি মহাপণ্ডিত! তা, আপনি তো সহজেই অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারতেন! কিন্তু তা না করে, আপনি ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?

স্বামিজী। আপনি বলতে পারেন মহারাজ, রাজকার্যে অবহেলা করে সাহেবদের সঙ্গে আপনি শিকার করে বেড়ান কেন?

রাম। কি সর্বনাশ! একি দুঃসাহসিক সাধু!

মৌলবী। কে জানে এঁর কপালে আজ কি আছে! মহারাজ যে রকম মেজাজের লোক—

মহারাজ। কিন্তু তার জন্যে তো আমাকে ভিক্ষা করতে হয় না? ভিক্ষা অতি হীন কাজ। বিশেষ করে সবল ও সুস্থ লোকের পক্ষে এই কাজ সমাজকে ভারগ্রস্ত করে তোলে। আপনার মত পণ্ডিত লোক স্বাবলম্বী হলে নিজের ও দশের কত কল্যাণ করতে পারতেন!

স্বামিজী। মহারাজ, হতে পারে এ বৃত্তি হীন! কিন্তু ভিক্ষুক কি শোষকের চেয়েও হীন?

মহারাজ। আপনার এ কথার অর্থ?

স্বামিজী। ভিক্ষুক পরের দয়ার দানে জীবন ধারণ করে! আর আপনি অপরের অর্থ শোষণ করে বিলাসিতায় অপব্যয় করেন।

মহারাজ। আমি তো কাউকে প্রবঞ্চিত করে এ কাজ করি না? কিন্তু আপনি যে সমাজকে প্রবঞ্চিত করে জীবন ধারণ করেন!

স্বামিজী। এই যুক্তিই যদি সত্য হয়—তবে, আপনি তো আরও বড় প্রবঞ্চক! কোন্ অধিকারে, আপনিও সবল সুস্থ থেকে-অপরের কষ্টার্জিত অর্থে বিলাসিতায় জীবন যাপন করেন?

মহারাজ। কিন্তু এটা তো প্রজাসাধারণের উপর আমার ন্যায্য অধিকার!

স্বামিজী। এই যদি আপনার অধিকার, তবে প্রজাদেরও তো আছে আপনার উপর কিছু অধিকার?

মহারাজ। কি অধিকার?

স্বামিজী। তাদের দুঃখ দৈন্যের খবর রাখবেন, অজন্মায় মহামারিতে তাদের রক্ষা করবেন, সর্বভাবে তাদের কল্যাণ সাধন করবেন—এই অধিকার! তারা স্বীকার করে আপনার অধিকার! কিন্তু আপনি কি স্বীকার করেন তাদের এই অধিকার?

রাম। উঃ, স্বামিজী কি নির্ভিক!

মৌলবী। হ্যাঁ, আর কি সুন্দর যুক্তি!

মহারাজ। কিন্তু তার জন্যে তো আমার কর্মচারীরা আছে!

স্বামিজী। তারা তাদের কর্তব্য করে। কিন্তু আপনি কি করেন আপনার কর্তব্য?

মহারাজ। স্বামিজী, আপনি অতি নির্ভিক! আর কেউ যদি আপনার মত এভাবে আমার সামনে কথা বলতো—

স্বামিজী। তা হলে তার গর্দান যেতো—এই তো? (হাসিয়া) কিন্তু মহারাজ, নির্ভয় না হলে তো সন্ন্যাসী হওয়া যায় না? আমি যে সন্ন্যাসী! নির্ভিক ভাবে সত্য প্রকাশ করাই যে আমার ধর্ম! মহারাজ, আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও পাইনি!

মহারাজ। কি প্রশ্ন?

স্বামিজী। কেন আপনি রাজকার্যে অবহেলা করে সাহেবদের সঙ্গে শিকার করে বেড়ান?

মহারাজ। (চিন্তিত ভাবে) কেন যে আমি ও কাজ করি, তা বলতে পারি না স্বামিজী! তবে ওটা আমার খুব ভাল লাগে।

স্বামিজী। তবে শুনুন মহারাজ কেন আমি ভিক্ষা করে বেড়াই সেই প্রশ্নের জবাব! ফকীরি করে ঘুরে বেড়াতে আমারও ভাল লাগে!

মহারাজ। আচ্ছা বাবাজী মহারাজ! এই যে সবাই মূর্তি পূজা করে— আমার ওতে মাটেই বিশ্বাস নেই। তা আমার কি দশা হবে?

স্বামিজী। মহারাজ কি রহস্য করছেন?

মহারাজ। না স্বামিজী, মোটেই নয়! সত্যই আমি কাঠ, মাটি, পাথর পূজা করতে পারি না! এতে কি পরজন্মে আমার নীচ গতি হবে?

স্বামিজী। মহারাজ, যার যেমন বিশ্বাস!

রাম। এ কি হলো? স্বামিজীর এই জবাবে তো মহারাজের শ্রদ্ধাহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া হলো!

স্বামিজী। মহারাজ ওই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা কার?

মহারাজ। আমার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের!

স্বামিজী। ওটার উপর থুথু ফেলতে পারেন?

মহারাজ। এ আপনি কি বলছেন স্বামিজী? তাতে যে স্বর্গীয় মহারাজকে অসম্মান করা হবে?

স্বামিজী। কেন? আপনিতো মহারাজের গায়ে থুথু ফেলছেন না?

মহারাজ। কিন্তু ওটা তাঁর প্রতিচ্ছবি তো? তাকে অসম্মান করলে মহারাজকেই অসম্মান করা হয়!

স্বামিজী। কিন্তু মহারাজতো ওতে নেই? ও তো সামান্য একখানা কাগজ মাত্র! এই সামান্য কাগজে আপনি থুথু ফেলতে পারেন না?

মহারাজ। (নীরব)

স্বামিজী। (হাসিয়া) পারেন না—কারণ, ওই ছবির দিকে তাকালেই মনে পড়ে স্বর্গীয় মহারাজের কথা। তখন ওই কাগজ আর সামান্য কাগজ থাকে না। তাই তাকে সম্মান করতে হয়! মহারাজ, ওই মূর্তি পূজাও ঠিক ওই রূপ! কেউই বলে না—হে প্রস্তর, আমি তোমার উপাসনা করি! হে খড়-মাটি, তুমি সদয় হও! মূর্তি দেখলেই ভক্তের মনে পড়ে তার চিন্ময় ইষ্টকে। তাই ভক্ত দেয় মূর্তির এত সম্মান।

মহারাজ। (করজোড়ে) প্রভো! আপনি যা বললেন তার প্রতিবর্ণ সত্য! এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম—কিছুই বুঝতে পারিনি! কেউ কখনও এমন সরলভাবে এ কথা বোঝাতে পারেনি আমায়! তাই আপন অজ্ঞতায় এই পবিত্র পন্থাকে দেখেছি ঘৃণার চোখে।

স্বামিজী। আমি তাহলে আসি মহারাজ!

মহারাজ। (করজোড়ে) আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন স্বামিজী! বলে দিন

—কিসে আমি সত্যের আলো দেখতে পারি, জীবনে শান্তি পেতে পারি?

স্বামিজী। মহারাজ, পরমাত্মা ব্যতীত কেউ কাউকে অনুগ্রহ করতে পারে না। আপনি তাঁর শরণাগত হন, অসীম করুণাসিন্ধু তিনি—তিনিই আপনাকে অনুগ্রহ করবেন।

মহারাজ। (পদতলে বসিয়া) আমার এই কলুষিত আঁধার জীবনে কোন সুকৃতির ফলে যখন এসেছে এই শুভলগ্ন—চাই আমি তাকে সফল করতে; চাই আমি এই চরণতলে বসে জীবনের পথ ঠিক করে নিতে।

স্বামিজী। ভগবান আপনাকে শুভবুদ্ধি দিন—শান্তি দিন!

## তৃতীয় দৃশ্য

### বৃন্দাবনের পথে এক গ্রামপ্রান্তের গাছতলা

স্বামিজী। ওঃ ভগবান! ক্ষুধায় অবসন্ন পা দুটো আর বইতে পারে না দেহের ভার। প্রচণ্ড শীতে একমাত্র কম্বল সম্বল—তা থেকেও তুমি আমায় এমনি ভাবে বঞ্চিত করলে? সবই তোমার খেলা প্রভু! আমি যে তোমার পায়ে আত্ম সমর্পণ করেছি ভগবান! নগ্ন দেহে পড়ে রইলাম আমি এই গাছের তলায়! জমাট হয়ে যাক আমার দেহের রক্ত। তোমার যদি থাকে কোন প্রয়োজন রক্ষা করো তাকে!

(জড়োসড়ো হইয়া উপবেশন)

(কম্বলের বোঝা কাঁধে লইয়া ফেরিওয়ালার প্রবেশ)

ফেরিওয়ালা। কি মুস্কিল! কোথায় এখন খুঁজবো আমি সন্ন্যাসীকে? অথচ আমি তো যেতেও পারছি না অন্য পথে! কে যেন ঘাড়ে ধরে নিয়ে চলেছে আমায়। ক্রমে যে এসে পড়লাম গাঁয়ের প্রান্তে জঙ্গলের কিনারে! আরে, এই তো বসে আছে এক সন্ন্যাসী! এই নাও সাধুবাবা কম্বল।

(কম্বল দান)

স্বামিজী। তুমি কে ভাই?

ফেরিওয়ালা। আর বাবা আমি কে! আমি একজন ফেরিওয়ালা। কে যেন আমার ঘাড় ধরে নিয়ে এলো এখানে।

স্বামিজী। সে কি ভাই?

ফেরিওয়ালা। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্যে যেই বসেছি এক গাছতলায়—ওমনি এসে গেল ঘুম। একটু পরেই কে যেন ধাক্কা মেরে তুলে বললো আমায়, শিগগীর যা। ওই বনের ধারে বসে আছে এক

সন্ন্যাসী—দিয়ে আয় তাঁকে একখানা কম্বল ; শীতে জমাট হয়ে যাচ্ছে তাঁর রক্ত। চল্ চল্ তাড়াতাড়ি চল! ব্যাস এইবার আমি খালাস! প্রণাম সাধুবাবা—এবার আমি যাই!

স্বামিজী। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন!

( ফেরিওয়ালার প্রস্থান )

( অশ্রুরুদ্ধস্বরে ) কে বলে তুমি ঘুমিয়ে আছ? কে বলে তুমি বধির? তুমি যদি ঘুমিয়ে থাকো, কে তবে আমায় দেখে? তুমি যদি বধির, কে তবে শোনে আমার ডাক? ভগবান তুমি সত্য—সত্য তোমার অমৃত বাণী—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহন্ ॥

## গীত

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
( মাঝে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে ) ॥
কুরুচি কুমন্ত্র যত, নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে।
( খুব যেন সাবধানে থাকে ) ॥

( চামারের প্রবেশ )

চামার। প্রণাম সাধুবাবা!

স্বামিজী। ভগবান মঙ্গল করুন!

চামার। এই শীতে কতক্ষণ আর গাছতলায় বসে থাকবেন সাধুবাবা?

স্বামিজী। কি জানি ভাই কতক্ষণ থাকবো! ক্ষুধায় অবসন্ন পা দুটো আর চলতে চায় না!

চামার। কিছু সেবা হয়নি সাধুবাবা?

স্বামিজী। না বাবা, ভগবান মিলাননি—তাই দুদিন হয়নি কিছু!

চামার। দুদিন খাওয়া হয়নি কিছু? আহা! শুকিয়ে গেছে সুন্দর কচি মুখখানা! পদ্ম ফুলের মত ওই চোখদুটো ক্ষুধায় হয়ে পড়েছে ম্লান। কি করবো, আমি কেমন করে খাওয়াবো! আমি যে চামার—ছোট জাত! সাধুবাবা, আপনাকে কিছু খাওয়াতে মনটা আমার আকুলি বিকুলি করছে!

স্বামিজী। মন যদি চায়, তবে আমায় কিছু খেতে দাও বাবা!

চামার। প্রাণ আমার তাই চাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে আমার তৈরী রুটী আপনাকে দেবো? আমি ডাল আটা আনি—আপনি তৈরী করে নিন!

স্বামিজী। আমি সন্ন্যাসী, এখন আমার আগুন-স্পর্শ করতে নেই!

চামার। তা হলে উপায়?

স্বামিজী। তোমার তৈরী রুটীই আমায় দাও!

চামার। কিন্তু বাবা, আমি যে জাতে চামার। আমার তৈরী রুটী আপনাকে দিলে যে আমার মহাপাতক হবে।

স্বামিজী। তোমার ঘর কতদূর ভাই?

চামার। এই তো ওই জঙ্গলের ওধারেই আমার কুঁড়েঘর।

স্বামিজী। চলো ভাই যাবো আমি তোমার সেই কুঁড়ে ঘরে। খাবো তোমারই তৈরী রুটী!

চামার। সেকি সাধুবাবা! তা হলে যে আমার সর্বনাশ হবে!

স্বামিজী। কেন?

চামার। সাধুর জাত মেরেছি জানতে পারলে জাতভায়েরা একঘরে করবে আমায়! ভদ্রলোকে জানতে পারলে রাজার দরবারে নালিশ করে

ভিটেছাড়া করবে আমায়। আমার খাবারে সাধুসেবা হবে কেন বাবা—আমি যে ছোট জাত!

স্বামিজী। ছোট জাত! তুমি নারায়ণ! যাবো আমি সেই মন্দিরে যেখানে বাস করেন এই দরিদ্র নারায়ণ! বুভুক্ষুর ক্ষুধার ব্যথায় বুকে বসে যার কাঁদেন ভগবান! ভগবান, কোথায় তুমি আছো বিশ্বনাথ! আছো কি তুমি রাজার প্রাসাদে বিলাস-ব্যসনে,—না রিক্ত দীন পাতার কুটীরে অস্পৃশ্য এই দরিদ্রের বুকে? চলো ভাই, যাবো আমি সেই দেবালয়ে, খাবো আমি সেই দেবভোগ—স্বয়ং নারায়ণ যা পেয়ে ধন্য হয়ে যান—!

## চতুর্থ দৃশ্য

### খেতরীর রাজবাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষ

( মহারাজ ও অলকা বাঈজী )

অলকা। মহারাজ, আমার একটি ভিক্ষা আছে!

মহারাজ। কি ভিক্ষা অলকা? কিসের অভাব তোমার?

অলকা। আপনার অনুগ্রহে পার্থিব অভাব আমার কিছু নেই। বংশানুক্রমে এই রাজবংশের অনুগ্রহে আমরা প্রতিপালিতা। কিন্তু এই সুখই তো চরম সুখ নয় মহারাজ!

মহারাজ। কি তুমি চাও অলকা?

অলকা। আমি চাই এমন কিছু, এই দেহ ও দৈহিক সুখের অন্তে যেটা থাকে আমার সম্বল!

মহারাজ। এমন সম্পদ তো আমার ভাণ্ডারে কিছু নেই অলকা!

অলকা। তা আমি জানি মহারাজ! সে ভাণ্ডারের সন্ধান আমি পেয়েছি কিন্তু আপনার কৃপা না হলে, সেখানে পৌছবে না আমার ভিক্ষার আবেদন।

মহারাজ। কে সেই ভাণ্ডারী অলকা?

অলকা। সেই অপার্থিব ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী খেতরীর রাজগুরু

মহারাজ। হ্যাঁ, এই গুরুর কৃপায় আজ ধন্য, কৃতার্থ খেতরীর মহারাজ! অফুরন্ত আমার গুরুর ভাণ্ডার! নিজে কেন তুমি প্রার্থী হও না তাঁর কাছে?

অলকা। না মহারাজ! আমি নীচ ঘৃণিত বাঈজী! দেখেছি তাঁর মাঝে আমার প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা

মহারাজ। আচ্ছা, কি তোমার প্রার্থনা অলকা ?

অলকা। রাজগুরুকে একটি ভজন শুনিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।

মহারাজ। এই তোমার প্রার্থনা ? আচ্ছা, অন্তরালে তুমি অপেক্ষা করো— এখুনি গুরুজীর শুভাগমন হবে।

( অলকার প্রস্থান )

( স্বামী বিবেকানন্দের প্রবেশ—মহারাজের প্রণাম )

বিবেকানন্দ। পরমাত্মা মহারাজের কল্যাণ করুন !

মহারাজ। গুরুজী, আমার মনে জেগেছে একটি সংশয় ? কিছুতেই তা থেকে মনকে মুক্ত করতে পারছি না আমি।

বিবেকানন্দ। কি সংশয় মহারাজ ?

মহারাজ। আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও মুসলমানের বাড়ীতে ছিলেন, হয়তো তাদের ছোঁয়াও খেয়েছেন ! এতে কি আপনার স্বধর্ম ক্ষুন্ন হয়নি ?

বিবেক। স্বধর্ম ! ( হাসিয়া ) আমি যে সন্ন্যাসী ! গৃহস্থের আচার অনুষ্ঠান তো আমার জন্যে নয় মহারাজ !

মহারাজ। সন্ন্যাসী হলেও তো আপনি হিন্দু ?

বিবেক। সন্ন্যাসীর জাত নেই ! ব্রহ্ম লাভের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করলে সন্ন্যাসী—আর আল্লাকে লাভ করতে সর্বস্ব ত্যাগ করলে হয় ফকির শুধু নামের তফাৎ—জাত তাঁদের এক ! কারণ ব্রহ্ম ও আল্লা এক হিন্দুও তাঁর—মুসলমানও তাঁর !

মহারাজ। তা হলে এই জাতিভেদ ভাল নয় ?

বিবেক। না। এই ভেদজ্ঞানেই মানুষ ভালবাসতে পারে না মানুষকে- তাই ভগবানকেও ভালবাসতে পারে না !

মহারাজ। এই ভেদজ্ঞানশূন্য হবার উপায় ?

বিবেক। যত্র জীব তত্র শিব—এই মন্ত্র।

মহারাজ। ওঃ, কি সংস্কারই না এত দিন আমার মনে বদ্ধ হয়েছিল ! আ

ভেঙ্গে গেল আমার ভুল। মানুষ এক—তফাৎ শুধ্ নামে। যত্র জীব—তত্র শিব! আমার এই প্রশ্নের জন্যে অপরাধ নেবেন না গুরুজী।

বিবেক। মনের সব সন্দেহ গুরুকে জানাবার অধিকার আছে শিষ্যের। মনের আঁধার দূর করে দেন বলেই গুরু—গুরু!

মহারাজ। আচ্ছা গুরুজী, এই জীবনটা কি?

বিবেক। প্রতিকূল অবস্থার মাঝে জীবের আত্ম স্বরূপ প্রকাশের নামই জীবন।

মহারাজ। আঃ, কি সরল মীমাংসা। আচ্ছা গুরুজী, শিক্ষা কি?

বিবেক। কোন চিন্তা বা ভাবধারাকে সংস্কার আকারে চিত্তে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার নামই শিক্ষা।

মহারাজ। চমৎকার। আর সত্য কি গুরুদেব?

বিবেক। পূর্ণ সত্য এক ও অদ্বিতীয়। পূর্ণ সত্য উপলব্ধি হলে আপেক্ষিক সত্যের মূল্য থাকে না।

মহারাজ। আজ বুঝলাম জীবনের উদ্দেশ্য। নবীন অরুণ আজই নিয়ে এসেছে আমার জীবনে প্রথম সুপ্রভাত—তাই আমি আশ্রয় পেয়েছি এই মহাপুরুষের চরণতলে।

বিবেক। মহারাজ, একটি কথা। যখন আমি দরবারে যাই, তখন আমার পদসেবা করা আপনার অসমীচীন।

মহারাজ। সে কি গুরুজী? গুরুপদ সেবার আবার স্থান কাল কি? যেখানেই হোক এই সুযোগ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

বিবেক। কিন্তু দরবারে আপনি রাজা।

মহারাজ। হ্যাঁ ঠিক। আর আপনি সেখানে রাজগুরু।

বিবেক। কিন্তু দরবারের একটা মর্যাদা তো থাকা দরকার। এতে যে প্রজাদের কাছে আপনার মর্যাদার হানি হবে?

মহারাজ। আমার প্রজাদের মাঝে যদি কারো হয় এমন দুর্মতি—তবে সে তার দুর্ভাগ্য। আমি চাই—তারা দেখুক, যার পায়ে আজীবন তারা

মাথা নুইয়ে এসেছে—সেই তাদের রাজাও কারো পায়ে মাথা নুইয়ে ধন্য হয়। রাজার সাথে প্রজারাও সেই পায়ে মাথা লুটিয়ে ধন্য হয়ে যাক।

বিবেক। ভারতের বহু দেশ, বহু রাজ্য, রাজদরবার দেখলাম। কিন্তু এই খেতরী রাজ্যের মত রাজভাগ্যে ভাগ্যবান প্রজা বোধ হয় আর কোথায়ও নেই।

মহারাজ। গুরুজী, রাজজীবনে কি আমার কর্তব্য ?

বিবেক। ধর্মের রক্ষা ও প্রজার পালন। বিশ্বরাজ্যের রাজা ঈশ্বর—আপনি তাঁর প্রতিনিধি। প্রজার ঐহিক সুখ-দুঃখের ভাব আপনার উপর ন্যস্ত করেছেন তিনি।

মহারাজ। গুরুজী, আর একটি নিবেদন আমার আছে।

বিবেক। কি নিবেদন মহারাজ ?

মহারাজ। আমার দরবারে একটি বাঈজী আছে। আপনাকে প্রণাম করে একটি ভজন সে আপনাকে শোনাতে চায়।

বিবেক। কিন্তু মহারাজ, বামাকণ্ঠের সঙ্গীত আদৌ আমার প্রীতিকর নয়। তাছাড়া, এ সব বাঈজী সাধারণতঃ—

মহারাজ। না গুরুজী, মেয়েটি সঙ্গীত ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু বিশেষ ভক্তিমতি। এর গান শুনলে মনে একটা পবিত্রভাবের উদয় হয়।

বিবেক। কিন্তু—

মহারাজ। এ প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে গুরুজী। এই কে আছিস,—অলকা।

( অলকার প্রবেশ )

অলকা, গুরুজী তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন। তাঁকে শোনাও তোমার ভজন।

( দূর থেকে বিবেকানন্দকে প্রণাম করে অলকা সুরু করে গাইতে )

## গীত

প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়,
দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী, এক লহর, বহত মিলি নীর ভরো।
যব মিলিহে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞান সে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

বিবেক। ওঃ, কি ভুল! আমি না সন্ন্যাসী? সর্বভূতে সমজ্ঞানই না আমার ধর্ম? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সার সত্য, এই সামান্য নারী আজ আমায় বুঝিয়ে দিল? (অলকার কাছে এসে) মা, তোমায় সামান্যা মনে করে পোষণ করেছিলাম যে ঘৃণা, তার জন্য ক্ষমা করো মা। বাঈজী হলেও তোমার প্রাণে জেগেছে ঈশ্বর প্রেমের সাড়া। সত্যই প্রেমময় ভগবান তোমায় কৃপা করেছেন।

অলকা। সত্যই ঈশ্বর প্রেমময়—করুণাময়। তাইতো আমি আজ তাঁরই করুণায় এই চরণের পরশ পেয়ে ধন্য হলাম। আশীর্বাদ করুন, এই পরশের পূণ্যে আমার ঘৃণ্য জীবনের দুঃসহ আঁধারে যেন পাই একটুখানি আলোর রেখা।

(বিবেকানন্দের পায়ে লুটিয়ে পড়ে অলকা)

## ষষ্ঠ দৃশ্য

## কুমারিকা

( অনন্ত বিস্তার সাগরের পটভূমিকায় শিলা খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া ভারতের দিকে চাহিয়া স্বামী বিবেকানন্দ )

বিবেক। নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী ভারতভূমি! মাগো, কি অপরূপা তুমি! কোথায়ও তুমি স্নিগ্ধ সরস করুণাময়ী, কোথায়ও উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী দুর্বার—কোথায়ও উষ্ণ অকরুণ অতি জ্বালাময়ী। মাগো, দেখালি আমায় রাজার প্রাসাদ, দীনের কুটীর—ঘুরালি আমায় গিরি-কন্দর, কত মরু কান্তার, কিন্তু কোন কল্যাণই তো হলো না আমার অবিরাম পথ-চলায়! আজ ক্লান্ত শ্রান্ত আমি দাঁড়ায়েছি তোর চরণ সীমান্তে। মাগো কন্যাকুমারী, আমার প্রণাম নাও মা!

### গীত

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে ॥
তুমি কি ভুবন নাথ
আমি ভিখারী অনাথ
কেমনে বলিব তোমায় এসহে মোর হৃদয়ে ॥
হৃদয় কুটিলদ্বার খুলি রাখি অনিবার।
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে।

কোথায় হবে আমার চলার শেষ! ওই যে বিশ্ব ধর্মসভা থেকে সব ধর্মের

আসে সাদর নিমন্ত্রণ! শুধু হিন্দু ধর্মেরই সেখানে হলো না স্থান! ধর্মগুরু প্রসবিনী সনাতন হিন্দু ধর্মের কেন এই অপমান? বলো, বলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মায়ের কোন্ কাজ সাধন করতে তুমি আমায় রেখে গেছো প্রভু? বৃথাই কি আমার অন্তরে তোমার শক্তি সঞ্চারণ? সত্যই কি নিষ্ফল হবে তোমার অবতার-লীলা? বলো, বলে দাও ঠাকুর—কি কাজ আমার?

( আকুল ক্রন্দন )

## শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া মূর্তির আবির্ভাব

এসেছো, এসেছো ঠাকুর! নিষ্ফল তবে হয়নি সন্তানের আকুল ক্রন্দন!

( বিবেকানন্দের মাথায় এক হাত রাখিয়া ছায়া মূর্তি
অপর হাত সদরের দিকে প্রসারিত করিলেন। )

পেয়েছি তোমার আদেশ, হয়েছে আমার পথের নিশানা! যাবো, যাবো আমি—জানাবো বিশ্ব ধর্মসভায় সনাতন হিন্দু ধর্মের মহিমা! ঠাকুর, চোখে দাও আলো, বুকে দাও বল—মুখে দাও ভাষা! শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং, শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং—শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম।

# বিকিরণ

## প্রথম দৃশ্য

### আমেরিকার বিশ্ব-ধর্ম মহাসভা

( মঞ্চের উপর উজ্জ্বল আলোক-রশ্মির মাঝখানে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দ )

Sisters and Brothers of America,

It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world; I thank you in the name of the mother of religions; and I thank you in the name of the milions and milions of the Hindu people, of all classes and sects.

My thanks, also, to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honour of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. Not only do we believe in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to tell you that I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, the word *exclusion* is untranslatable. I am proud to belong to a nation which has sheltered the refugees and the persecuted of all the religions and all the nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered into our bosom the purest remnant of the Israelites, a remnant that came to Southern India, and took refuge with us, in the very year in which their holy

temple was shattered by Roman tyranny I am proud to belong to the religion which has sheltered, and is still fostering, the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines frow a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, a hymn which is every day repeated by millions of human beings: "*As different streams, having their sources in different places, all mingle their waters in the sea, so, O Lord, do the different paths which men through their different tendencies take various though they appear, crooked and straight alike, all lead to Thee.*"

The present convention, which is one of the most august assemblies over held, is in itself a vindication, a declaration to the world, of the wonderful doctrine preached in the Gita: "*Whosoever comes to Me, by whatsoever form, him do I reach. All men are struggling along paths which lead in the end to Me.*" Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled it with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilizations and sent whole natians to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would by this time have been far more advanced than it now is. But their time is come; and I fervently hope that the bell that rang this morning in honour of this convention may prove the death-knell to all fanaticism, to all persecutions by sword or pen, and to all uncharitable feelings between human beings wending their way to the same goal.

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### বরাহনগর বাগান বাড়ী

( রাখাল, বাবুরাম ও লাটু )

সকলে। জয় শ্রীরামকৃষ্ণের জয়! জয় বিবেকানন্দের জয়!

রাখাল। আহা, ঠাকুর! কি অপার লীলা তোমার! তুমি তো যাওনি ঠাকুর! প্রতিনিয়তই তো তোমার সন্তানদের হাত ধরে পথে চালাও! নইলে কোন শক্তিবলে আজ নরেন বিশ্বজয়ে ধন্য হলো? ধন্য, ধন্য তুই ভাই নরেন! ঠাকুরের সুকৃতি সন্তান তুই!

বাবুরাম। সত্যিই তুমি ধন্য নরেন, সত্যিই তুমি শ্রেষ্ঠ! ঠাকুরের অসীম শক্তির তুমি অধিকারী। আহা, ঠাকুরের কি দিব্য দৃষ্টি—তাই তোমার হাতে সব ভার অর্পণ করে গেছেন। আর তোমার হাতে সঁপে দিয়ে ধন্য করে গেছেন আমাদের।

লাটু। আরে লরেন ভাইয়া, তু কুথা আছিস্‌রে ভাইয়া। লে ভাইয়া তোর লাটু ভাইয়ার পরণাম। (প্রণাম) ঠাকুর হামাদের তোরই ভিতর আছেরে ভাইয়া—তু হামাদের মাথার মণি।

সকলে। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জয়।

রাখাল। দেখেছিস বাবুরাম, নরেনের মুখে যেন সরস্বতী বয়ে গেছে। ঠাকুরের ভাব নরেনের মুখে যেন বন্যার মত সারা জগৎ ভাসিয়ে দিয়েছেন।

বাবুরাম। আরে রাখাল, ভাসিয়ে দেবে না? অতবড় আধার জগতে ক'টা এসেছে? নরেনের ভিতর বসে ঠাকুর নিজে সব বলিয়েছেন। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

লাটু। আরে রাখাল ভাইয়া, উদেশে লরেন ভাইয়াকে খুব ভালবেসেছে, মান দিয়েছে?

রাখাল। হ্যাঁ লাটু ভাই, খুব ভালবেসেছে ?

লাটু। নরেন ভাইয়ার ইয়া বড়া বডা তসবির নোকি পথে ঝুলাইয়ে দিয়েছে ?

রাখাল। হ্যাঁ পথে ঘাটে কাগজে শুধু নরেনেরই কথা।

লাটু। আ হা হা। নরেন ভাইয়া তু কুথা আছিসরে ভাইয়া ! জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর।

( মাটিতে গড়াগড়ি )

বাবুরাম। আজ অবহেলিত হিন্দু ধর্ম যেন নূতন প্রাণ পেলো। পেলো নূতন রূপ—পেলো বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠ আসন। সবই তোমার খেলা ঠাকুর—সবই তোমার খেলা।

( গিরীশের প্রবেশ )

গিরীশ। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে রাখাল, বাবুরাম, লাটু, আজ আনন্দের দিন—আয়, আয় কোলাকুলি করি। ওরে, নরেন—আমাদের নরেন বিশ্বজয় করেছে। আয়, আয়—( সকলকে জড়াইয়া ) জয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রণাম।

( উদ্দেশ্যে সকলের প্রণাম )

রাখাল। কিন্তু দেখেছেন এই বিধর্মীদের সঙ্কীর্ণতা ? এরই মধ্যে তারা হিন্দু ধর্ম ও নরেনের নামে নানা কুৎসা রটাচ্ছে।

গিরীশ। আরে ভাই, তা ছাড়া তাদের উপায় কি ? যে ভাবে নরেন হিন্দু ধর্মের সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করেছে, তাতে যে তাদের সবই পণ্ড হতে বসেছে।

বাবুরাম। শুধু কি তাই ? ওরা এত নীচ যে, কতকগুলো অসচ্চরিত্রা মেয়ে-মানুষ পাঠিয়ে নরেনের নামে কুৎসা রটনার চেষ্টা করেছে।

গিরীশ। তাই নাকি ? শালারা এত দূর নামতে পারে ? তাদের পেলে—তাদের টুটি কামড়ে দুঃশাসনের মত আমি রক্তপান করে ফেলতাম।

বাবুরাম। না না, ছি ছি, তারা নীচ বলে—আমরা কেন ছোট হবো? তাদে গালমন্দ করবো? আজ আমাদের আনন্দের দিন। আজ আমর সবাইকে ভালবাসবো, সবাইকে ক্ষমা করবো।

গিরীশ। ঠিকই বলেছিস ভাই। কোন কালেই আমার মুখের আগল নেই দেখেছিস তো ঠাকুরকে পর্যন্ত কত গালমন্দ করেছি। করুণাময় তিনি তাই আমার সব অপরাধ মার্জনা করে পায়ে ঠাঁই দিয়েছিলেন তোরা সবাই আমার গুরু। তোদের মাঝে বসেই ঠাকুর আমায় শেখাবেন

বাবুরাম। না না, আমাদের অপরাধী করবেন না জি. সি.। আপনাকে আমর বড ভাই বলে মনে করে।

গিরীশ। জানিরে জানি। তাতেই তো আমি ধন্য হয়ে গেছি। তাই তে তোদের না দেখে থাকতে পারি না। ঠাকুরের জন্যে মন যখন বড় ব্যাকু হয়—সব ফেলে তোদের কাছে ছুটে আসি জ্বালা জুড়াতে। তোদের গা আছে ঠাকুরের পরশ, অন্তরে আছেন ঠাকুর নিজে। ওরে ঠাকু বলতেন—নরেন সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন, ওকি আর জলে মেশে নরেনকে যদি নিজের চোখে দেখি কোন অন্যায় করতে, বুঝবো আমা চোখের দোষ—উপড়ে ফেলবো চোখ।

রাখাল। চলুন সকলে আজ মা ভুবনেশ্বরীর কাছে। এই শুভ দিনে তাঁকে প্রণাম করে আসি।

গিরীশ। তাই চল্। মায়ের কাছে যাই। ধন্য মা তুমি বীর-প্রসবিনী তোমার রক্ত দিয়ে গড়া, তোমারই হৃদয়সুষমায় প্রস্ফুটিত ফুল। আ তারই সৌরভে ধরণী বিভোর। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, জ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

(সকলের প্রস্থান)

## তৃতীয় দৃশ্য

লণ্ডন

( মিঃ স্টাডির বাড়ী )

বিবেক। বেদ বলেন—আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। কেবলমাত্র পঞ্চভূতে আবদ্ধ হয়ে আছেন। যখন তিনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত হন—তখনই কর্মফলের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেন। হিন্দুধর্মের এই লক্ষ্য—এই আসল ভাব। কেবল মাত্র শাস্ত্রবিচারেই খুশী থাকতে চান না তাঁরা—চান, অতীন্দ্রিয় সত্বাকে সাক্ষাৎ করতে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু—বিশ্বাসই বস্তু নয়। বস্তু—আত্মোপলব্ধি। অপরোক্ষানুভূতিই সেই বস্তু লাভের পথ।

( ধীরে ধীরে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ হইতে মঞ্চের ভিতর আলোক-রশ্মির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল ইংরাজ মহিলা মার্গরেট নোবেল। )

বিবেক। কে মা তুমি ?

মার্গরেট। আমার নাম মিস্ মার্গরেট নোবেল।

বিবেক। কি তুমি চাও মা ?

মার্গরেট। যদি অপরাধ না নেন, তবে করতে চাই কয়েকটি প্রশ্ন।

বিবেক। বেশ মা, প্রশ্ন করো। কিন্তু কি তোমার পরিচয় ?

মার্গরেট। আমি এক ক্যাথলিক ইংরাজ পরিবারের কন্যা।

বিবেক। কি তোমার প্রশ্ন ?

মার্গরেট। এতদিনের শিক্ষা-দীক্ষায় আমি যা অর্জন করেছি—ভারতীয় এই সন্ন্যাসীর বাণীর সাথে তার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না কেন ?

বিবেক। ( হাসিয়া ) তোমার প্রশ্নের উত্তর তো তোমার নিজের কথায়

ভিতরই রয়েছে মা। তুমি জড়বাদী, ঐশ্বর্যের ভোগবিলাসের মাঝে পালিতা তুমি। জড়বাদের অতীত না হলে তো অদ্বৈতবাদ বোঝা যায় না মা।

মার্গরেট। ভোগবিলাসে পালিতা হলেও, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি আকর্ষণ আমার সহজাত। সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বের বহুবিধ ধর্মমত ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিতির সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

বিবেক। তাতে কি তোমার লাভ হয়েছে মা ?

মার্গরেট। লাভ হয়েছে এই যে, বিলাস-ব্যসন তুচ্ছ করে মন আমার ছুটে চলে জ্ঞানালোকের সন্ধানে। খৃষ্ট ধর্মাচার্যদের কাছে ধর্ম সম্বন্ধে যা জেনেছি তার মূল কথা—বিশ্বাস। আর আপনি শোনালেন আরও গভীর কথা—আত্মোপলব্ধি। আত্মার মাঝেই আছেন পরমাত্মা। জড় ও চৈতন্যের এই যে বিভেদ—এর সামঞ্জস্য কোথায় স্বামিজী ?

বিবেক। সামঞ্জস্য আছে মা। জগতের বিরাট থেকে অনু-পরমাণু পর্যন্ত সবই সেই এক ব্রহ্মসত্বার বিকাশ। বক্তৃতায় হবে না—গ্রন্থে পাবে না। উপলব্ধি যদি করতে চাও, সাধনা করতে হবে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিনির্দিষ্ট পথে। পরিচিত হতে হবে ভারতীয় ভাবধারার সাথে। সবার আগে চিনতে হবে সেই ভাবধারার জননী ও পালিনী ভারতবর্ষকে।

মার্গরেট। হৃদয়ের আকুল আবেগ আর আমি চেপে রাখতে পারি না স্বামিজী দিনের পর দিন শুনি আপনার বক্তৃতা—আর ফিরে যাই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বুকে নিয়ে। আবার ছুটে আসি। কিসে যেন টানে—চুম্বকের মত অদ্ভুত আকর্ষণ। ব্যথাতুর অন্তর আমার অবিরত কেঁদে যায়—কোথাও পায় না শান্তির সন্ধান। আজ সুপ্ত মন আমার জেগে উঠে দেখেছে সত্যের তড়িৎ চমক। নবজাগ্রত চেতনা প্রাণের গভীর থেকে যেন বলছে ডেকে—এই তো জীবনের শুভলগ্ন। ওই তো তোমার চিরবাঞ্ছিত ধ্যানের ছবি—যে তোমায় দেবে নিত্য আলোকময় এক অধ্যাত্মলোকের

সন্ধান। শ্রান্ত ক্লান্ত এই কন্যা তোমার, তোমার চরণতলে ঢেলে দিতে চায় তার জীবনের ভার।

বিবেক। কিন্তু মা, ক্ষণিক আবেগের বিহ্বলতা শেষে জাগ্রত বাস্তব যে অতি অকরুণ।

মার্গরেট। হোক অকরুণ। আমি যাবো তার পারে। যার প্রাণের ভিতর দিয়েছো অমৃতলোকের সন্ধান, কানে দিয়েছো বিশ্বজগতের মহাসাগ্নিকের উদাত্ত মহামন্ত্র—কোথায় হবে তার এই আবেগের শেষ? আমি চিরমগ্ন রবো এই বিহ্বলতার মাঝে।

বিবেক। কি করবে তুমি ভারতের বুকে?

মার্গরেট। তোমার চরণ ছায়াতে বসে প্রাণ ঢেলে দেবো ভারতের কল্যাণে।

বিবেক। প্রতিদানে পাবে লাঞ্ছনা, অর্ধাশন, অনশন— গভীর বেদনা।

মার্গরেট। সেই বেদনার অগ্নিপরশে নির্মল পবিত্র হবো আমি। হবে আমার সত্তার পূর্ণ বিকাশ—পাবো আমি অমৃতের সন্ধান।

বিবেক। বেশ, তাই যেয়ো মা।

মার্গরেট। কবে, কবে আসবে সেদিন, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতের ধূলির পরশে ধন্য হবো আমি?

বিবেক। ধৈর্য ধরো মা। যেদিন পূর্ণ হবে কাল, আসবে আমার গুরুর নির্দেশ—কানে আসবে আমার জন্মভূমির ডাক। বিবেকানন্দের মানসতনয়া, তোমায় আমি উপহার দেবো ভারতমাতার কোলে। নিবেদন করে দেবো শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদীমূলে নীলসাগরের এই শ্বেত শতদল।

## চতুর্থ দৃশ্য

### দক্ষিণেশ্বরের সংলগ্ন পঞ্চবটী

( বাবুরাম ও রাখাল )

বাবুরাম। লীলাময় ঠাকুর, কি যে তোমার মনে ছিল, আর কি দিয়ে কি করালে তা তুমিই জানো। নরেন দিগ্বিজয় করে ফিরে এলো—তোমার ভাব দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল। এ কি আমাদের কল্পনাতেও কোনদিন ছিল ?

রাখাল। ঠিক বলেছিস বাবুরাম। আমেরিকা আর ইংলণ্ডের কতশত নরনারী নরেনের কাছে দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিল। নরেনের বিশ্ব-জয়ের বিজয়টিকা দেবতার নির্মাল্যের মত এই নিবেদিতা। এমন শুদ্ধ-সত্ত্বের আধার যে জড়বাদীর দেশে কি করে জন্মালো ! এ অতি বিচিত্র !

বাবুরাম। পঙ্কেই তো পদ্ম ফোটে রাখাল ! পূজারী তাকে পঙ্ক থেকে তুলে এনে অঞ্জলি দেয় দেবতার পায়ে। ভক্তচূড়ামণি বিবেকানন্দ জড়বাদের পঙ্ক থেকে তুলে এনে, এই শ্বেত-কমল নিবেদন করেছে ঠাকুরের পায়ে।

রাখাল। সবই তো হলো কিন্তু ভাই, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নরেনের কল্পনা কি ঠিক ? আমার যেন মনটা সায় দিচ্ছে না।

বাবুরাম। সেইটাই তো বিশেষ চিন্তার কথা হয়ে উঠেছে ভাই ! আমারও যেন কেমন মনে হচ্ছে, না ওটা ভাল বলে।

( নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের প্রবেশ )

বিবেক। নিবেদিতা, এই হল সেই পুণ্য-পীঠস্থান ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র পঞ্চবটী ! এই সেই বেদী—এইখানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ !

( উভয়ের বেদীমূলে প্রণাম )

নিবেদিতা। কতদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ঠাকুরের?

বিবেক। মৃত্যু? (হাসিয়া) ঠাকুরের মৃত্যু হয় না নিবেদিতা!

নিবেদিতা। তবে কোথায় আছেন তিনি?

বিবেক। কোথায়? আকাশে, বাতাসে, ওই গঙ্গার জলে, ওই মন্দির তলে— প্রতি অণুপরমাণুতে বিশ্ব ছেয়ে আছেন তিনি। বেঁচে আছেন তিনি আমার অন্তরে, তোমার অন্তরে—

নিবেদিতা। আমি তো তাঁকে দেখিনি চোখে—

বিবেক। ক্ষোভ কেন নিবেদিতা? দেখ তাঁকে মানস নয়নে! ডুব দাও অন্তর গভীরে—দেখো উজ্জ্বল হয়ে সেখানে ফুটে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি!

(চোখ নিমিলিত করে দাঁড়ায় নিবেদিতা)

নিবেদিতা। ছবি! এই ছবিতে কবে আসবে প্রাণ?

বিবেক। চলে যাও ওই ঠাকুরের ঘরে! বসে যাও ধ্যানে। গভীর ধ্যানে প্রাণের মাঝে প্রাণান্ত হবে ওই ছবি, পাবে তাঁর কল্যাণ আশীষ পরশ!

[সকলকে প্রণাম করিয়া নিবেদিতার প্রস্থান

রাখাল। কি রত্নই যে তুই এনেছিস নরেন!

বিবেক। তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কন্যা-স্নেহে ওকে তোরা রক্ষা করিস ভাই!

বাবুরাম। ও কথা আর বলিস কেন ভাই! ওযে আমাদের গর্বের সম্পদ!

রাখাল। দেখ ভাই নরেন, তোর এই মঠ ও মিশনের পরিকল্পনা—এও তো বন্ধন! তবে আর সন্ন্যাস হলো কি?

বিবেক। সন্ন্যাস বলতে তাহলে কি বুঝিস তুই? আমি তো বুঝি ক্ষুদ্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, বিরাট মানবতার কল্যাণে জগদ্ধিতায় যে বন্ধন— তাই সন্ন্যাস।

বাবুরাম। সেই প্রচার, সেই হিসাব নিকাশ, সেই কচ্‌কচিই যদি করতে হয়— তবে মুক্তির চিন্তা করবো কখন?

বিবেক। আপন মুক্তির চিন্তাই কি সন্ন্যাস? এতো স্বার্থপরের কথা! সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে যেতে পারি তবেই তো? এই কথা একদিন আমি বলেছিলাম। তিরস্কার করে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন স্বার্থপর! সেই দিনই আমি বুঝেছি সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম।

রাখাল। আমার ভাই মনে হয়, ঠাকুরের এ উপদেশ ছিল না।

বিবেক। (উত্তেজিত স্বরে) কি বললি? এ উপদেশ ছিল না ঠাকুরের? তোরাই কি শুধু চিনেছিলি ঠাকুরকে? আমি কি তবে কিছুই চিনিনি?

রাখাল। রাগ করিসনে ভাই! তোর হাতেই যখন ঠাকুর দিয়ে গেছেন আমাদের—তখন তোর কথামতই কাজ হবে।

বিবেক। সেটা প্রভুত্ব আর আনুগত্যের কথা! প্রভুত্ব করতে আসিনি আমি আমি এসেছি প্রাণ জয় করতে। নিজের মুক্তির আশায় সন্ন্যাস নেওয়াই যদি ঠাকুরের উপদেশ হয়—তবে চাই না আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে।

বাবুরাম। বলিস্ কি নরেন?

বিবেক। হ্যাঁ, চাই না আমি এমন ক্ষুদ্র আদর্শকে! (উত্তেজিত স্বরে) বলো, বলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন তুমি শিখিয়েছো আমায় এই ভুল করতে! বলে দাও কোনটি ভুল—আর কোনটি নির্ভুল! বলে দাও, বলে দাও— আমি আজ চাই তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে।

(ছুটিয়া প্রস্থান)

রাখাল। একি সর্বনাশ হলো বাবুরাম!

বাবুরাম। দাঁড়া, আমি দেখে আসি কি করে নরেন। রক্ষা করো ঠাকুর, রক্ষা করো।

(ছুটিয়া প্রস্থান)

রাখাল। ঠাকুর রক্ষা করো! ঠাকুর রক্ষা করো!

( গিরীশের প্রবেশ )

গিরীশ। কিরে রাখাল, এখানে একা দাঁড়িয়ে ?

রাখাল। সর্বনাশ হয়েছে জি. সি.। নরেন ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেছে ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

গিরীশ। সে আবার কি কথারে ?

রাখাল। মঠ আর মিশন গড়া নিয়ে নরেনের সঙ্গে হয়েছে আমাদের মতান্তর। তাই ক্ষেপে গেছে সে।

গিরীশ। ( ক্ষোভের সঙ্গে ) দেখ রাখাল, ঠাকুরের বিরাট মণ্ডলের এক একটা অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তোরা। কেন বুঝিস না এই সামান্য কথাটা—পাশ্চাত্যের গর্বোন্নত শির লুটিয়ে পড়ে যাঁর পায়ে, ঠাকুরের অনন্ত ভাব-রাশি কি বিরাজ করে না তাঁর অন্তরে ? কেন তবে ঠাকুর তাঁরই হাতে দিয়ে যাবেন তোদের ভার ?

রাখাল। উঃ জি, সি, প্রকৃতই অগ্রজ আপনি ! কি ভুলই করেছি আমরা। আপনি আজ ভেঙ্গে দিলেন সেই ভুল।

( দ্রুত বাবুরামের প্রবেশ )

বাবুরাম। রাখাল, রাখাল—এই যে, জি. সি. ! দেখবি চল রাখাল ! ঠাকুরের শয্যার পদতলে গভীর ধ্যানে মগ্ন নরেন। ললাটে তাঁর খেলছে কি প্রশান্ত দিব্য জ্যোতি ! নির্মিলিত নয়নতলে যেন ফুটে উঠেছে সত্য শিব সুন্দরের ছবি। আর সংশয় নেই, আর আমার সংশয় নেই।

রাখাল। না, আর সংশয় নেই ! কি করে নরেনকে শান্ত করা যায় জি. সি. ?

গিরীশ। কে কাকে শান্ত করে রে ভাই ? তুই আমি—আমরা কে ? যাঁর নরেন, তিনিই তাঁকে শান্ত করে দেবেন ! চল্ চল্ ধ্যানস্থ বিবেকানন্দকে দেখে সার্থক করে আসি চোখ দুটো ! চল্ চল্—

## পঞ্চম দৃশ্য

## বেলুড়-মঠ

( মন্দিরে রামকৃষ্ণ-বেদীতলে বসিয়া বিবেকানন্দ, রাখাল, নিবেদিতা, গোপাল, বাবুরাম, কালী। )

বিবেক। স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

সকলে। শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং, শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং, শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্।

বিবেক। (দাঁড়াইয়া) ঠাকুর, তুমি বলেছিলে, যেখানেই তোমায় কাঁধে করে নিয়ে আমি রাখবো—সেখানেই তুমি থাকবে! থাকো তুমি অনন্তকাল ধরে এই সুরধনীর তীরে। ওপারে তোমার লীলাক্ষেত্র মা ভবতারিণীর মন্দির—তার মাঝে চির জাগ্রতা মা! এপারে তুমি চিরজাগ্রত সন্তান তাঁর। আসে-পাশে তোমাদের কল্যাণ দৃষ্টির তলে নিশ্চিন্তে খেলে বেড়াক অবোধ অবুঝ সন্তানের দল! তোমার বিরাট আলোকস্তম্ভ থেকে বিচ্ছুরিত করো তীব্র জ্যোতি! দিকে দিকে ছুটে যাক তার বিচিত্র রেখা—আলোকিত হোক বিশ্বের বিবিধ আঁধার পথ! সেই আলোকে পথ দেখে বিশ্বের মানুষ ছুটে আসুক তোমার বেদীতলে। ভুলে যাক ভেদাভেদ—চলুক যত মত তত পথে! হোক এক দ্বন্দ্বহীন হিংসাহীন মহামানবতার উদ্বোধন!

সকলে। শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং, শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং, শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্!

( রাখাল, বাবুরাম, গোপাল ও কালীর প্রস্থান )

নিবেদিতা। গুরুদেব, মনে জেগেছে কয়েকটি সংশয়!

বিবেক। বলো আমায়, আমি করে দেবো তার সমাধান।

নিবেদিতা। পাদ্রী সম্প্রদায় কয়েকটি প্রশ্নে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করছে আমায়। আমারও মনে জেগেছে সংশয়—তাই পারছি না তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে।

বিবেক। কি তাদের প্রশ্ন?

নিবেদিতা। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে আপন দেশ ছেড়ে কেন এসেছি আমি এখানে?

বিবেক। আত্মসুখের জন্যে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে জন্ম হয়নি তোমার। পরের হিতের তরে জন্মেছো তুমি।

নিবেদিতা। এই অনুন্নত দেশে কে দেবে আমার সেবা ধর্মের মর্যাদা?

বিবেক। এ হলো তোমার দেশের শাসক মনোবৃত্তির কথা—তাই বোঝে না তারা ভারতের সেবাধর্মের মর্যাদা! রাজনীতিই নিয়ন্ত্রিত করে তাদের ভাব—তাই বোঝে না মানব-নীতির কথা! ভারত পরাধীন বস্তুতান্ত্রিকতার কাছে—কিন্তু শিক্ষক সে আধ্যাত্মিকতায়!

নিবেদিতা। কোথায় আমি সুযোগ পাবো এই সেবা-ধর্মের? এখানে নেই কোন ভাল হাসপাতাল, নেই কোন শিক্ষিতা নার্স?

বিবেক। ভারতের প্রতিটি গৃহই হাসপাতাল! ভারতের প্রতিটি নারীই মাতা, কন্যা, জায়া রূপে স্বেচ্ছাব্রতী মমতাময়ী সেবিকা!

নিবেদিতা। নারীর সম্মান দিতে জানে না এদেশ! এদেশের নারী যাপন করে ক্রীতদাসীর জীবন!

বিবেক। ক্রীতদাসী? বলে দিও সেই মূর্খদের, পাশ্চাত্যের মত এদেশের নারী নয় শুধু পুরুষের বিলাসসঙ্গিনী! এদেশের নারী পুরুষের কাছে পেয়েছে দেবীর আসন। যে রামকৃষ্ণ বেদীমূলে তুমি আজ নিবেদিতা, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনী নারীকে ইষ্টের আসনে বসিয়ে মাতৃরূপে করে গেছেন পূজা—দিয়ে গেছেন বিশ্বের নারীকে অভূতপূর্ব সম্মান।

নিবেদিতা। ঠিক। এইবার আমি দেবো তাঁদের প্রশ্নের উত্তর।

বিবেক। আপন মনের কোণে নেই তো মা কোন সংশয় ?

নিবেদিতা। না, নিঃসংশয় আমি। আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা আর প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার মাঝে গড়ে তুলবো এক সেতু ! তারই মাধ্যমে হবে যে সংমিশ্রণ তাতেই হবে নূতনের সৃষ্টি !

বিবেক। মা, তোমার এই নব-জীবনে এসেছে কি প্রাণে শান্তির ইঙ্গিত ?

নিবেদিতা। ইঙ্গিত নয় গুরুদেব, এসেছে নিশ্চিত শান্তির পরশ। অতীতের গাঢ় তমসার বুকে জেগেছে নবীন আলোর রেখা। মরে গেছে জড়বাদী মার্গরেট। তার কবরের 'পরে দাঁড়িয়েছে আজ সন্ন্যাসীর মানসকন্যা ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা !

বিবেক। গুরুর আশীর্বাদে সফল হোক তোমার নবজীবন !

নিবেদিতা। কল্পনার যা ছিল অতীত—তাই আজ হয়েছে বাস্তব। মানস নয়নে আমার ভাসে এক গরিমাময় ছবি। আমি যেন প্রাচীন ভারতের তাপস তনয়া গার্গী—দাঁড়ায়েছি আজ মহাতপা গার্গর পাশে !

( প্রণাম ও প্রস্থান )

বিবেক। তাই হোক মা ! সফল হোক তোমার মানস ছবি। হোক তোমার স্থান মহিয়সী খনা লীলাবতী মৈত্রেয়ী গার্গীর পাশে !

( প্রস্থান )

( লাটুর প্রবেশ )

লাটু। না বাবা, হামারা ইসব বরদাস্ত হোবে না ! এতো আইন মাফিক কাজ, ই হামার চলবে না। হামি বাবা ঠাকুরকে পরনাম করে এই বেলা বিশ্বনাথজীকে পাশ সড়ে পড়ি !

( বেদীমূলে প্রণাম। বিবেকানন্দের প্রবেশ )

বিবেক। কিরে লেটো, লাঠি কম্বল নিয়ে কোথায় চলেছিস ?

লাটু। হামি ভাইয়া কাশী যাচ্ছে, ইথানে আর থাকবে না !

বিবেক। কেন রে? এখানে কি হলো? তোদের নিয়ে মঠ তৈরী হলো, তোরা একে চালাবি—আর তুই কাশী চলে যাচ্ছিস?

লাটু। মঠ হইয়েছে তো ভাল হইয়েছে। লেকিন হামার ইধাব চলবে না। তুই আমরিকা ঘুরলি, বিলাইত ঘুরলি—মঠ গড়লি, তার কোতো কান্নন করলি। ও কানুন হামার বরদাস্ত হোবে না। আরে ভাইয়া, জপধ্যান কি ঘড়ি মাফিক চলে?

বিবেক। ওরে পাগলা, এই জন্যে তুই চলে যাচ্ছিস? ওসব আইন কানুন তরুণ সন্ন্যাসীদের জন্যে—তাদের ওতে দরকার আছে। ঠাকুরের ছেলেদের আবার কানুন কিরে? যা-যা, সব রেখে আয়!

লাটু। (হাসিয়া) আরে ভাইয়া, আমরিকায় ঠাকুরের কথা কি বললি কুছ্ বোল তো?

বিবেক। (হাসিয়া) ও তুই বুঝবি না, তুই মুখ্যু!

লাটু। লেকিন, তুই কুছ্ সমঝায়ে দে না?

বিবেক। না, তোকে আমি বোঝাতে পাববো না!

লাটু। যো কুছ জানে, উসকা সমঝানা মুসকিল। যো কুছ জানে না, উস্‌কা সমঝানা তো সোহজ আছে! হামি মুরুখ্ হামাকে ভি তুই সমঝাতে পারিস না? তবে তুই হামারা সে ভি বড়া মুরুখ্।

বিবেক। (প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া) ঠিক বলেছিস লেটো! সত্যিই আমি কিছু জানি না—খালি কথার সাগর! তুই মুখ্যু বলেই ঠাকুরের খাঁটি ভাবটি বুঝেছিস! কাশী তাহলে সত্যিই যাচ্ছিস?

লাটু। (বিবেকানন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া) ওরে ভাইয়া তোকে ছেড়ে কুথায় যাবো! ঠাকুর যে তোর হাতে হামাদের দিয়ে গেল। তুহার ভিতরই তো হামার ঠাকুর। হামি যে ভাইয়া তুহার প্রেমে মরিয়ে আছে! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

(প্রস্থান)

বিবেক। লাটু ভাই তুমি অদ্ভুত! সার্থক তোমার অদ্ভুতানন্দ নাম। ঠাকুরের গাথা অপরূপ মালার অতি শুভ্র কুসুম তুমি!

( গিরীশের প্রবেশ )

গিরীশ। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

বিবেক। এসো, এসো জি. সি.! তুমি তো কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে কোন দিন একটু বেদান্ত ছুঁলে না!

গিরিশ। আরে ভাই ওতে আমার দরকার কি? আমি দূর থেকে বেদান্তকে নমস্কার করি। তোকে দিয়ে ঠাকুরের লোকশিক্ষার দরকার ছিল—তাই তোকে ওসব পড়তে হয়েছে। জয় বেদান্তরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।

( উদ্দেশ্যে প্রণাম )

বিবেক। তোমাকে ঠাকুর বলতেন ভৈরব। আজ তাঁর কথার মানে বুঝতে পারি!

গিরীশ। কি জানি ভাই তিনি কি বুঝতেন—আর তোরা কি বুঝিস! আমি শুধু বুঝি—তিনি পাপী তাপী উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তাই এ অধমকেও পায়ে ঠাঁই দিয়েছিলেন। আচ্ছা নরেন, বেদান্তে কি দুঃখীর দুঃখ, ক্ষুধার্তের চোখের জল আর ব্যভিচারের পাপ নিবারণের উপায় লেখা আছে?

বিবেক। বুঝেছি জি. সি. কোথায় তোমার ব্যথা! তোমার অমর প্রতিভা নিয়ে লেখনী মুখে নাট্য-সাহিত্যের মাধ্যমে কর এর প্রতিকার।

গিরীশ। আমার অন্তরে এই ব্যথা—এও জাগিয়েছেন ঠাকুর! আর তোর মুখ থেকেই তিনি বলে দিলেন প্রতিকারের পথ। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয়!

বিবেক। জি. সি. একটি জীবের দুঃখ দূর করতে আমি হাজারবার গর্ভবাস করতে প্রস্তুত।

গিরীশ। বুঝি নরেন—বুঝি! এত বড় হৃদয় না হলে কি তুই জগৎ মাতাতে পারিস? ঠাকুরের অনন্ত দয়া; ওই নাম করেই এবারকার মত পাড়ি দেবো। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয়!

(প্রস্থান)

বিবেক। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার জয়! ঠাকুর কাজ তো তোমার শেষ হয়ে এলো! কানে ভেসে আসছে ওপারের ডাক—ফিরে যেতে হবে আপন ঘরে! রেখে যাবো যা, ভবিষ্যত ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে তার! ওগো আমার এপারের ভাই-ভগ্নির দল! রেখো স্মরণে বিবেকানন্দের বাণী—হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতীর আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ—সর্বত্যাগী শঙ্কর! ভুলিও না—তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত! ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি-মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই! বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই! আর বলো দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মানুষ করো! মাগো জগজ্জননী, তোর একটি সন্তানের মুক্তির তরে যুগে যুগে যেন আমি ধরার ধূলায় এসে ধন্য হই! আমি স্বর্গ চাই না—চাই না আমি মহানির্বাণ! নারায়ণ, বিশ্বদেব, জানাই তোমায় নমস্কার!

**সমাপ্ত**

# উন্মেষ

## প্রথম দৃশ্য

### শিমুলিয়ার দত্ত বাড়ী

দোতলার দরদালান। ভুবনেশ্বরীর চুলের গোছা দুই হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে বিলের প্রবেশ। চুল ছাড়াইবার চেষ্টা করেন ভুবনেশ্বরী।

ভুবন। ওরে হতভাগা ডাকাত, ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দে। উঃ মাগো, চুল যে আমার ছিঁড়ে গেল!

বিলে। না, ছাড়বো না। কিছুতেই ছাড়বো না!

ভুবন। দাড়া, তোকে আজ মেরেই ফেলবো।

(ঝাপটা-ঝাপটি করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

বিলে। ছেড়ে দাও মা, আর কখনও এমন করবো না!

ভুবন। ছেড়ে দেবো? থাক এই ঘরে সারাদিন বন্দী হয়ে! এই কে আছিস? দেখিস, যেন কেউ এই ঘরের দরজা খুলে না দেয়।

(ভুবনের পুনঃ প্রবেশ)

ওঃ, কি দস্যি ছেলে! আমাকে একেবারে হিমশিম্ খাইয়ে দিয়েছে। সারাদিন ওর উৎপাতে বাড়ীশুদ্ধ লোক পাগল হয়ে গেল! ওকে নিয়ে যে আমি কি করবো ভেবে পাইনে!

(নীরবে পিছন দিক হইতে বিশ্বনাথের প্রবেশ)

শ্বনাথ। (মৃদু হাসিয়া) ওঃ বাবা! মেজাজটা যেন বড়ই গরম মনে হচ্ছে!

**ভুবন।** ( ঝামটা মারিয়া ) গরম হবে না? এক'শ বার হবে!

**বিশ্বনাথ।** তা, তা আমি তো কোন অপরাধ করিনি?

**ভুবন।** করোনি? তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া!

**বিশ্বনাথ।** ( হাসি গোপন করার চেষ্টা করিয়া ) তা, গোড়ার কারণ আবিষ্কার তো হলো! কিন্তু ডগার ঘটনাটা তো কিছুই বোঝা গেল না এখনও?

**ভুবন।** বোঝাবুঝির আছে কি? বাপকে নিয়ে জ্বলেছি এতকাল—এখন জ্বলছি ছেলেকে নিয়ে। যেমন বাপ, তেমনি হয়েছে তার ছেলে।

**বিশ্বনাথ।** মায়েদের কাছে বাপেদের এই চিরন্তন অপবাদ মোচনের কোন পথই যখন কেউ খুঁজে পায়নি কোনদিন—তখন আমার পক্ষে সে চেষ্টা বৃথা। কিন্তু ছেলে আবার করলো কি?

**ভুবন।** করলো কি, তার হিসাব আছে? কি না করছে সে?

**বিশ্বনাথ।** কোথায় গেল সে?

**ভুবন।** রেখেছি সেই দস্যিকে ওই ঘরে বন্ধ করে। ওর জ্বালায় পাগল হয়ে গেলাম আমি।

**বিশ্বনাথ।** ( মৃদু হাসিয়া ) অদ্ভুত তোমাদের মায়ের প্রাণ। যখন পাওনি ওকে—এত থাকতেও তুমি হয়েছিলে পাগল! আবার পেয়েও একটুতেই এখন হচ্ছো পাগল!

**ভুবন।** ( মৃদু হাসিয়া ) হচ্ছি বেশ করছি। তুমি পুরুষ, মুক্ত আকাশের স্বাধীন বিহঙ্গ! বুঝতে পারবে না ~~নীড়গত প্রাণ পক্ষিনী~~র মনের কথা!

( হাসিয়া ) তা হলে এই দুমুখো রোগের ওষুধটা এখন কি?

**ভুবন।** ( হাসিয়া ) ওষুধ? ওই দস্যিই তো আমার সব রোগের মহাওষুধ! ও আমার ইষ্ট দেবতা বীরেশ্বর শিবের করুণার দান! ওকে পেয়েই তো সব জ্বালা জুড়িয়েছে আমার!

বিশ্বনাথ। (কপট অভিমানে) তবে আর অকারণ আমার ওই অপবাদটা—

ভুবন। (কপট রোষে) অকারণ? তুমি কি কম জ্বালিয়েছো আমায়?

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) বিশ্বনাথ মহাদেব তো আপন অনাচারে চিরকালই জ্বালিয়েছেন ভুবনেশ্বরীকে!

ভুবন। (উজ্জ্বল মুখে গদগদ স্বরে) আবার তাঁকেই জন্মে জন্মে পেতে ভুবনেশ্বরী নব নব রূপে করেছে কঠোর তপস্যা। জীবনের যা কিছু আমার সুখের, সবই এই শিবঠাকুরের দান!

(নত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম)

বিশ্বনাথ। দরজাটা এবার খোলো, ওটাকে একটু দেখে যাই!

ভুবন। না! ছেলের দুঃখে, একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে বাপের প্রাণটা—না?

বিশ্বনাথ। সেটা যে স্বাভাবিক ভুবন! অতি শৈশবে আমায় সংসার-মরুতে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন আমার বাবা। পিতৃস্নেহ কি তা আশৈশব জানি না আমি! পুত্রস্নেহ দিয়েই তাই পূরণ করতে চাই আমার সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা!

ভুবন। (কাতর স্বরে) ওগো, অমন করে বলো না আর! এখুনি আমি খুলে দিচ্ছি দরজা।

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) না! মায়ের শাসনের উপর কর্তৃত্ব করলে, বাপের শাসনও মানে না সন্তান।

(হাসিমুখে প্রস্থান)

ভুবন। আমার বিলে! আমার ইষ্ট দেবতার দান! কিন্তু বড় দুরন্ত হয়েছে ওটা! আর শুধুই কি তাই? সংসারের ক্ষতিই কি কম করে? কোন জিনিসের উপর দরদ নেই! ফকির, বোষ্টম, ভিখারী দেখলে তো সামনে

যা পাবে হু'হাতে টেনে বার করে দেবে। (নেপথ্যে ঘরের দিকে তাকাইয়া) থাক দস্যি ওই ঘরে আটক!

( নবীনের প্রবেশ )

দেখো নবীন, তোমাদের সকলকে বলা রইলো—যখন বাড়ীতে ভিখারী বোষ্টোম আসবে, বিলেকে পাহারায় রাখবে। কিছুতেই ওকে বাইরে যেতে দেবে না।

**নবীন।** আচ্ছা। কিন্তু মা, বিলুভাইকে কি ওঘরে আটকে রেখেছেন?

**ভুবন।** হ্যাঁ, কেন?

**নবীন।** তবেই হয়েছে! এতক্ষণ তা হলে ঘর একেবারে পরিষ্কার।

**ভুবন।** সে কি নবীন?

**নবীন।** হ্যাঁ মা ঠিক! ঘর এতক্ষণ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি বাইরে থেকে আসার সময় দেখি, আপনার ঘরের নীচেতে রাস্তায় এক ভিখিরী। উপর থেকে জানলা গলিয়ে বিলুভাই ফেলে দিল তার গায়ের উপর একখানা কাপড়। আমি কেড়ে নিয়ে এলাম—এই দেখুন সেই কাপড়।

**ভুবন।** সর্বনাশ! দাঁড়া সর্বনেশে ডাকাত—দেখাচ্ছি তোকে মজা!

( ক্ষিপ্ত হইয়া দ্রুত ভিতরে প্রস্থান )

**নবীন।** হ্যাঁ, বড়লোকের ছেলে বটে! বিলুভাইয়ের নজর কত উঁচু! গরীব দুঃখীর উপর কত দয়া! যে যা চায়, তাই দিয়ে দেয়। গালমন্দ করো, মারধোর করো তাতে তার বয়েই গেল! হবে না কেন? যেমন দয়াময়ী পুণ্যবতী মা, তেমনি সদাশিব দানশীল বাপ। বড় হলে বিলুভাই বাপ মায়ের নাম রাখবে—মস্ত দাতা হবে। যাই, এখানা আবার জায়গায় রেখে আসি।

( প্রস্থান )

(বিলের চুলের মুঠো ধরিয়া সজোরে টানিতে টানিতে ক্রুদ্ধ ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

**ভুবন।** বল, এমন কাজ আর করবি কি না?

**বিলে।** করবো, এক'শবার করবো।

**ভুবন।** এখনও বলছিস্ করবি? তোর কান টেনে আজ ছিঁড়েই ফেলবো।

(কান টানিতে রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল বিলে)

কত আরাধনা করে শিবের কাছে করেছিলাম পুত্র কামনা! তিনিও আমায় এমন ফাঁকি দিলেন? নিজে না এসে আমার কপালে পাঠালেন কিনা একটা ভূত।

**বিলে।** কি? আমি ভূত? (ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে টানিয়া ধরে মায়ের চুল) আমি ভূত? আমি ভূত?

**ভুবন।** নিশ্চয় ভূত! তা না হলে এমন হয়? ওরে ছাড়, ছাড়—আমার চুল ছিঁড়ে গেল যে! ছাড়, ছাড়--

**বিলে।** না ছাড়বো না। কিছুতেই ছাড়বো না।

**ভুবন।** উঃ, আমি যে গেলাম। ছাড়, ছাড়—

(ছাড়াইতে না পারিয়া দু'হাতে জড়াইয়া ধরেন বিলেকে বুকের মাঝে। তার মাথায় রাখেন হাত)

(উচ্চৈস্বরে) শিব, শিব, শিব!

(স্তব্ধ বিলে নিমিলিত চোখে ঢলিয়া পড়ে মায়ের বুকে)

এ কি হলো, বিলে এমন হয়ে গেল কেন? এ আমার কি হলো? (কাতর স্বরে) শিব শঙ্কর, জয় বাবা বীরেশ্বর!

**বিলে।** (চোখ খুলিয়া) তুমি অমন করছো কেন মা?

ভুবন। তুই যে কেমন হয়ে গেলি বাবা!

বিলে। আমি কি খুব দুষ্টুমী করেছিলাম মা?

ভুবন। হঁ্যা বাবা।

বিলে। আর আমি কক্ষনও দুষ্টুমী করবো না মা।

ভুবন। হঁ্যা বাবা, করো না। তুমি আমার লক্ষ্মী সোনার চাঁদ ছেলে। চলো তোমায় খেতে দিই। মহাদেব, বীরেশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সত্য, তুমি সত্য।

( কপালে হাত ছোঁয়াইয়া প্রণাম )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### বিশ্বনাথের বৈঠকখানা

নবীন। ওঃ, কি বিশ্বাসঘাতক এই মেয়েমানুষ জাতটা! এরা না পারে কি—এ্যাঁ? এরা সব পারে। নিজেদের গরজে এরা স্বামীকে বিষ খাওয়াতে পারে—ছেলের বুকে ছুরী বসাতে পারে। ওঃ, ভাবতে গেলে আমার মাথায় খুন চড়ে যায়। নাঃ, বিয়ে জিনিসটাই অতি কদর্য—আর পুরুষ জাতটাই বোকা। তা না হলে এই রাক্ষুসীদের ছলাকলায় ভোলে? এই নাক মলছি, কান মলছি! আর যদি বিয়ের কথা ভাবি, তবে এই শর্মা মুচির কুকুর। ( নাক কান মলা )

( কাঁধে সীতার মূর্তি লইয়া বিলের প্রবেশ )

বিলে। এখানে একলা কি করছো নবীনদা?

নবীন। মনটা ভাল নেই ভাই আজ ক'দিন!

বিলে। কেন, কি হলো?

নবীন। সে আর তুমি শুনে কি করবে ভাই! তা তোমার কাঁধে ওটা কি? পুতুল?

বিলে। না না, পুতুল নয়—মা-জানকী!

নবীন। ( ক্রুদ্ধ হইয়া ) ফেলে দাও, ফেলে দাও ভাই—এক্ষুনি ভেঙে ফেলো ওই পুতুল!

বিলে। কেন, ভেঙ্গে ফেলবো কেন? আমি যে এঁকে পূজা করি!

নবীন। না—না ভাই! ও যে মেয়েমানুষ!

বিলে। ঝ্যাঃ, ইনি মানুষ হবেন কেন—ইনি যে দেবী!

নবীন। আরে ভাই, ও দেবীই হোক আর মানুষই হোক—মেয়ে গন্ধ যেখানে

আছে, সেখানেই সর্বনাশ। ওরা সবাই সমান শয়তান। ওদের কোন কথাই শুনো না। আর বাচতে যদি চাও— বিয়ে কক্ষনো করো না। অমন পাজী কাজ আর নেই।

**বিলে।** সে কি নবীনদা? বিয়ে যদি খারাপ কাজ তবে আমার বাবা বিয়ে করেছেন কেন?

**নবীন।** আরে ভাই, তোমার বাবার কথা ছেড়ে দাও। তিনি তো দেবতা!

**বিলে।** তা, আমার মাও তো মেয়েমানুষ। তাঁর কথাও তা হলে শুনবো না?

**নবীন।** তোমার মায়ের কথা আলাদা! তিনি কি মানুষ? তিনি দেবী! অমন মা ক'টা আছে?

**বিলে।** আচ্ছা নবীনদা! শ্রীরামচন্দ্র তো ভগবান! তবে তিনি বিয়ে করেছিলেন কেন?

**নবীন।** যেমন করেছিলেন, তেমনি তার ফলও হাতে হাতে পেয়েছিলেন! চোখের জলে কাটাতে হলো সারাটা জীবন! রামায়ণ শুনেছো তো?

**বিলে।** হুঁ, মায়ের কাছে রামায়ণের সব গল্প শুনেছি আমি!

**নবীন।** তবেই বোঝো, আমার কথা ঠিক কি না? এই বিয়ে করেছিলেন বলেই তো রামচন্দ্রের এত দুঃখ কষ্ট। বিয়ে করলেন, আর কিছু দিনের মধ্যেই বনবাস। ফলে দশরথের মৃত্যু—আর অযোধ্যাপুরী একেবারে শ্মশান। গেলেন বনে, রাবণ করলো সীতাকে চুরি - ফলে সোনার লঙ্কা একেবারে ছারখার। ফিরলেন সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায়! প্রজারা করলো সন্দেহ—হলো সীতার বনবাস। ফলে, কেঁদে কেঁদেই কাটলো রামচন্দ্রের সারাটা জীবন! তাহলে দেখলে ভাই, বিয়েটা কি পাজী জিনিস!

**বিলে।** (চিন্তিতভাবে) হুঁ, ঠিকই বলেছো নবীনদা। আমি কক্ষনও বিয়ে করবো না।

**নবীন।** হ্যাঁ, এই তো পুরুষের মত কথা। বিয়ে কখনও করো না।

(**প্রস্থান**)

**বিলে।** তা হলে আমি এখন করি কি? সীতাদেবী তো মেয়েমানুষ—কি করে এঁর পূজা করি?

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

**ভুবন।** এই বিলে! আমি সারা বাড়ী খুঁজছি, আর তুই এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস্?

**বিলে।** (কাঁদোকাঁদো ভাবে) মা, আমার সর্বনাশ হলো!

**ভুবন।** কেন, কি হলো রে?

**বিলে।** আমি আর সীতাদেবীকে পূজা করতে পারবো না!

**ভুবন।** কেন, কি অপরাধ করলেন উনি?

**বিলে।** উনি যে মেয়েমানুষ! নবীনদা বলেছে, মেয়েমানুষকে বিয়ে করাও চলবে না – পূজা করাও চলবে না।

**ভুবন।** এই দেখো নবীনের কাণ্ড! আবার কি খেয়াল ঢুকিয়ে দিয়ে গেল এই পাগলের মাথায়। নারে, নবীনে কিছু জানে না।

**বিলে।** না মা, নবীনদা যা বলে তা ঠিক! ও অনেক জানে।

**ভুবন।** (হাসিয়া) তাই নাকি? বেশতো, তাই যদি হয় – তাতেই বা কি? তুই পুরুষের পূজা কর। দেবাদিদেব বীরেশ্বর ভোলানাথ শঙ্কর—পুরুষ। তুই তাঁরই পূজা কর।

**বিলে।** (হাসিয়া) হ্যাঁ মা, আমি তাই করবো। আজই আমি কিনে আনবো মহাদেব। ঠিক, তাইই করবো আমি!

(**প্রস্থান**)

**ভুবন।** (হাসিয়া) রোজ নূতন বায়না, নূতন খেয়াল! কি যে করি এই পাগলকে নিয়ে!

## তৃতীয় দৃশ্য

**ভুবনেশ্বরীর শোবার ঘর : সন্ধ্যা**

( সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ )

**ভুবন।** যোগসিদ্ধি মহাতেজা জনক নামেতে রাজা
আমি সীতা তাহার নন্দিনী।
দশরথ সুত রাম নব দুর্বাদল শ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি ॥
শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর ঘর,
কতমত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত শাশুড়ী গণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক ॥

( বিলের প্রবেশ )

**বিলে।** উঃ, কি যে করি ! এত ধ্যান করছি, কিন্তু জটা আর বাঁধে না !

( দুই হাতে আপন মাথার চুল টানাটানি )

**ভুবন।** কিরে বিলে. চুল টানাটানি করছিস কেন অমন করে ? চুল যে ছিঁড়ে যাবে।

**বিলে।** আচ্ছা মা, দেখতো আমার চুল খুব বড় হয়েছে কিনা ? আর জটা বেঁধেছে কিনা ?

**ভুবন।** কেন রে, তাতে আবার কি হবে ?

**বিলে।** শিবঠাকুরের মত জটা গজালে তিনি আমায় কৈলাসে যেতে দেবেন। কত ধ্যান করছি, কিন্তু কিছুতেই গজাচ্ছে না জটা।

**ভুবন।** ধ্যান করলে কি হয়?

**বিলে।** শিবঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায়। আর দেখতে পেলেই এত বড় জটা গজিয়ে যায়। দেখনা মা, আমার জটা গজালো কি না?

**ভুবন।** তাই নাকি? কই, এদিকে আয়তো দেখি!

( বিলের মাথায় হাত দিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া )

হুঁ, একটু একটু যেন জটা জটা মনে হচ্ছে!

**বিলে।** ( হতাশার স্বরে ) মোটে একটুখানি? তবে আর কি হলো? ধ্যান বোধ হয় ঠিক মত হচ্ছে না আমার! এই চল্লাম আমি ধ্যান করতে। যতক্ষণ না এই এত্তবড় জটা গজায়, কিছুতেই উঠবো না আমি!

( দ্রুত প্রস্থান )

**ভুবন।** ( হাসিয়া ) কি পাগল ছেলেরে বাবা! সব সময় একটা না একটা খেয়ালে আছে।

( এ্যাটর্নির বেশভূষায় সজ্জিত বিশ্বনাথের প্রবেশ )

( প্রণাম করিয়া রামায়ণ বন্ধ করিয়া রাখিয়া ভুবনেশ্বরী উঠিলেন। )

**ভুবন।** আজ এত তাড়াতাড়ি এলে যে?

**বিশ্বনাথ।** আজ বিশেষ সুসংবাদ আছে ভুবন!

**ভুবন।** ( ঈষৎ হাসিয়া ) কোন নির্দোষীকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে এলে বুঝি?

**বিশ্বনাথ।** ( সবিস্ময়ে ) ফাঁসিতে ঝুলিয়ে!

**ভুবন।** তা ছাড়া তোমাদের আবার শুভসংবাদ কি? নির্দোষীকে দোষী প্রমাণ করা, চোরকে সাধু প্রমাণ করা—সাধুকে খুনে প্রমাণ করে ফাঁসীতে ঝোলানোই তো তোমাদের কাজ!

**বিশ্বনাথ।** ওঃ, আমাদের উপর তোমার ভয়ানক রাগ দেখছি!

**ভুবন।** হবে না? টাকার খাতিরে তোমরা দিনকে রাত করো। সত্য মিথ্যার কোন বালাই তোমাদের নেই।

**বিশ্বনাথ।** কেন, আমরা কি কোন ভাল কাজ করি না? আমরাও তো মানুষ—

**ভুবন।** হ্যাঁ, মানুষ—কিন্তু তোমরা আগে উকিল, তারপর মানুষ।

**বিশ্বনাথ।** এ অভিযোগের জবাব তো আইন-শাস্ত্রের গণ্ডির ভিতর পড়ছে না!

**ভুবন।** তাতো পড়ছেই না। আর ওর বাইরের কিছু চোখেও পড়ে না তোমাদের।

**বিশ্বনাথ।** না ভুবন। এ আমাদের উপর তোমার অবিচার। আমরা মানুষও নই অমানুষও নই। আমরা সত্যান্বেষী। নীতির চোখে, ন্যায়ের চোখে মানুষ-অমানুষ কিছু নেই। কিন্তু এর বাইরে আমাদের যে সত্তা—

**ভুবন।** (হাসিয়া) এই দেখো—আবার সুরু হলো বক্তৃতা! ওগো, এটা আদালত নয়, আর আমিও বিচারপতি নই যে, বক্তৃতা দিয়ে আমাকে বোঝাতে হবে।

**বিশ্বনাথ।** হুঁ, মুসকিল তো আমাদের এইখানে। আদালতের সামনে আমরা ছয়কে নয় করি। কিন্তু এই আদালতের সামনে, ~~দোর্দণ্ড বিচারপতির তাড়ার~~ সব বুদ্ধি-শুদ্ধি গুলিয়ে যেন কেমন হয়ে যাই।

**ভুবন।** (হাসিয়া) থাক, থাক,—খুব হয়েছে এ্যাটর্নিমশায়! নাও এখন বলো তোমার শুভসংবাদটা।

**বিশ্বনাথ।** একটা বড় মামলায় আজ জয়লাভ হয়েছে আমার। সুনামও হয়েছে অর্থাগমও হয়েছে বেশ। আজ যা চাইবে তুমি, তাইই আমি দোবো তোমাকে।

**ভুবন।** ওঃ, একেবারে দাতা-কর্ণ!

**বিশ্বনাথ।** হ্যাঁ। এখন বলো কি চাই তোমার।

ভুবন। দেবেই যদি, তবে দুই জোড়া আটপৌরে শাড়ী কিনে দাও আমায়।

বিশ্বনাথ। ( সবিস্ময়ে ) কেন, কাপড় কি তোমার নেই ?

ভুবন। না না, আমার জন্যে নয়! ও বাড়ীর হারানের বউ, কাপড় অভাবে বেরুতে পারে না ঘর থেকে— তাকেই দেবো।

বিশ্বনাথ। বেশ, সরকার মশাইকে দিয়ে আজই আনিয়ে দেবো। বলো, আর কি চাই ?

ভুবন। আর— কানাইয়ের বড় অভাব, তার ছেলেটার একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও।

বিশ্বনাথ। বেশ, কানাইকে ডেকে করে দেবো সেই ব্যবস্থা।

ভুবন। আর, আর একটা জিনিস আমায় দেবে ?

বিশ্বনাথ। সঙ্কোচ কেন ? আমি তো বলেছি, যা আজ চাইবে— তাই-ই দেবো তোমায় ?

ভুবন। অনাথা হারুর মা বুড়ী কাশী যাবে— পোনেরোটা টাকা যদি তাকে—

বিশ্বনাথ। বাঃ বাঃ— তোমার এ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ভুবন। কেউই রিক্ত ফিরে যায় না এ দ্বার থেকে। কে জানে, আরও কতজন তোমার গোপন করুণায় ধন্য হয়ে যায়!

ভুবন। তোমার যদি অসুবিধা হয়, তবে—

বিশ্বনাথ। না না— আমায় ভুল বুঝো না ভুবন। যাকে যা দিয়ে তোমার তৃপ্তি— তাকে তাই-ই দাও। ঐশ্বর্যের লোভ বা সঞ্চয়ের মোহ আমার নেই। তুমি তো জানো ভুবন, সন্ন্যাসী পিতার সন্তান আমি! ঐশ্বর্য আমি নিয়েও আসিনি পৃথিবীতে, যাবার বেলায় এ থেকে নিয়েও যাবো না কিছুই। আমি যাবো— বেচে থাকবে শুধু, যা আমি দিয়ে যাবো। আলো-আঁধারে, সুখে-দুখে ভরা দুদিনের এই পৃথিবীর বুকে এসে— আঁধার পিছনে রেখে, নিরাশা ঠেলে ফেলে— যতটুকু পারো আনন্দ লুটে নাও।

(সুখী করো, আনন্দ দাও। আপন অশ্রু মুছে যাক, অপরের অশ্রু মুছিয়ে দাও) এই তো আমার নীতি ভুবনেশ্বরী!)

**ভুবন।** (মুগ্ধ ভাবে) জানি, জানি ওগো, আমি সব জানি! আমার অন্তঃ যে তোমারই অন্তরের ছবি।

**বিশ্বনাথ।** যাক, নিজের জন্যে তো কিছুই চাইলে না ভুবন?

**ভুবন।** আমার তো কোন অভাব নেই। আমি যে সবই পেয়েছি তোমার।

(নেপথ্যে নবীনের চিৎকার—ওরে বাপ্। সাপ, সাপ, সাপ। এই এতবড় গোখরো সাপ।)

**ভুবন।** (চিৎকার করিয়া) সেকি। কোথায় সাপ?

(নেপথ্যে নবীন—ওই যে ওই ঘরে—বিলের মাথার উপর)

**ভুবন।** বিলের মাথার উপর সাপ।

**বিশ্বনাথ।** কি সর্বনাশ!

(ছুটিয়া উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

**ভুবন।** মহাদেব, বীরেশ্বর, ভোলানাথ, আমার বিলেকে রক্ষা করো—রক্ষা করো।

**বিশ্বনাথ।** ওই যে ফণা নামিয়ে চলে যাচ্ছে।

**ভুবন।** শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর!

(বিলেকে বুকে জড়াইয়া ভুবন ও বিশ্বনাথের প্রবেশ)

**ভুবন।** বিলে, বিলে! শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু।

বিলে। (চোখ খুলিয়া) কি হয়েছে মা?

ভুবন। চোখ মেলেছিস বাবা! সাপ কামড়ায়নি তো? বাবা বীরেশ্বর রক্ষা করেছেন।

বিলে। সাপ! কোথায় সাপ মা?

বিশ্বনাথ। (সবিস্ময়ে) সে কি! তুই কিছুই জানিসনে বিলে?

বিলে। না তো!

বিশ্বনাথ। ওখানে বসে কি করছিলি তুই?

বিলে। শিব ঠাকুরের ধ্যান করছিলাম।

বিশ্বনাথ। ধ্যান করছিলি! কিছুই জানতে পারিসনি?

বিলে। না তো!

বিশ্বনাথ। (গম্ভীরভাবে) হুঁ। দেখ ভুবন, বিলে আমার সন্ন্যাসী হবে। আমার বাবাও সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। পৌত্রান্ত ফল—ও-ও সন্ন্যাসী হবে।

ভুবন। (বিরক্ত স্বরে) ও কি কথা! বিলে সন্ন্যাসী হতে যাবে কোন দুঃখে? ঠাকুরের আশীর্বাদে বিলে আমার রাজ-রাজেশ্বর হোক। আচ্ছা, আমি তোমার খাবার দিতে বলে আসি।

(প্রস্থান)

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) বড় হয়ে তুই কি হবিরে বিলে?

বিলে। আমি সন্ন্যাসী হবো বাবা।

বিশ্বনাথ। কিন্তু তোর মা যে বলে তুই রাজ-রাজেশ্বর হবি?

বিলে। না বাবা, তার চেয়ে কোচোয়ান হবো।

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) সে কি রে? কোচোয়ানের তো তা হলে খুব বড় পদ!

বিলে। বড় পদ নয়? আমি কি যে সে কোচোয়ান হবো? আমার গাড়ীতে যে চড়বে তাকে একেবারে ঠিক্ ঠিক্ ঠিকানায় পৌঁছে দেবো।

(প্রস্থান)

বিশ্বনাথ। ( হাসিয়া ) আচ্ছা তাই দিস। ( আত্মগতভাবে ) ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরেছিলেন অশ্ববল্গা। তুইও টেনে ধরতে চাস ঘোড়ার রাশ। কে জানে সেই টানে কোথায় পড়বে টান—ঘটবে কি অঘটন।

( ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ )

ভুবন। চলো, তোমার খাবার দিতে বলেছি।

বিশ্বনাথ। চলো যাচ্ছি।

ভুবন। দেখো, একটা কথা। কেন তুমি বিলেকে সন্ন্যাসী হবার কথা বললে?

বিশ্বনাথ। তাতে কি হয়েছে? ও আরও কি হতে চায় জানো? ও হতে চায় কোচোয়ান!

ভুবন। যা ওর অদৃষ্টে আছে, তাই হোক—শুধু সন্ন্যাসী যেন না হয়।

বিশ্বনাথ। সন্ন্যাসীদের উপর কেন তোমার এই বিরাগ ভুবন?

ভুবন। বিরাগ নয়—ভয়। ঠাকুর সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। চিরদিন তোমাকেও দেখছি পার্থিব সব ব্যাপারে থেকেও, অন্তরে তুমি বৈরাগী। ওর ক্রিয়া-কলাপেও মনে হয়—এ পৃথিবীর কোন কিছুতেই ওর মোহ নেই। এর বাইরের কোন টানে যেন ও অস্থির হয়ে বেড়ায়। ওগো, তাই তো আমার এত ভয়।

বিশ্বনাথ। ভয় কেন ভুবন? রাজ-রাজেশ্বরের জননী হওয়ার চেয়ে সন্ন্যাসীর জননী হওয়া পরম ভাগ্যের, পরম গৌরবের কথা। ~~জানো তাদের দানের কথা?~~ এই ধরার বুকে কত রাজ-রাজেশ্বর এলো—গেল। পৃথিবীর যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর ভোগ করে গেল তারা—কিন্তু দিয়ে গেল না কিছুই। আর মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী—পৃথিবীর নিলো না কিছুই, আর দিয়ে গেল যা, তারই উপর আজ জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। ~~যুগ-যুগান্তরের সাধনালব্ধ~~

~~সে সত্য দিয়ে গেলো তারা, তারই ক্ষীণায়মান জ্যোতি এখনও এই কলুষিত মানব জাতিকে ধ্বংসের চিরান্ধকার থেকে রক্ষা করে চলেছে।~~

ভুবন। ওগো, ভুল বুঝো না আমায়। ও যে আমার ইষ্টের দান। ওকে হারালে কি নিয়ে বাচবো আমি ?

বিশ্বনাথ। ইষ্টের দান তাঁরই উপর নির্ভয়ে ছেড়ে দাও ভুবন। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন। বিলের ভাগ্যদেবতা ঠিকই চালাবেন তাকে তার নির্দিষ্ট পথে। তুমি আমি কে ?

## চতুর্থ দৃশ্য

### বিশ্বনাথের বৈঠকখানা

( সন্দেশ খাইতে খাইতে বিলের প্রবেশ )

**বিলে।** আঃ কি মজা, কি আনন্দ! যাবো, যাবো—আর দুই ইঞ্চি বাড়লেই আমি যাবো।

( ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ )

**ভুবন।** কোথায় যাবিরে বিলে?

**বিলে।** মা, দেখোতো আমায় মেপে আমি দুই ইঞ্চি বেড়েছি কিনা?

**ভুবন।** সে আবার কিরে?

**বিলে।** হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কাল রাতেই দু ইঞ্চি বেড়ে গেছি আমি। দেখো না মা, একবার আমায় মেপে?

**ভুবন।** একরাতে কেউ বাড়ে দু'ইঞ্চি? আর কি হবে দু'ইঞ্চিতে?

**বিলে।** ওই দুই ইঞ্চিতেই তো আটকে গেছি আমি। ওইটুকু হলেই, ব্যাস্ কাশিমচাচার সঙ্গে একেবারে কাশ্মীর।

**ভুবন।** ও, সেই জন্যেই এত মাপামাপি? ( হাসিয়া ) তা বেশ! তুই খাচ্ছিস কি ও?

**বিলে।** কাশিমচাচা সন্দেশ দিয়েছে, তাই খাচ্ছি।

**ভুবন।** সর্বনাশ! মুসলমানের ছোঁয়া সন্দেশ খাচ্ছিস? ফেলে দে।

**বিলে।** কেন, ফেলে দেবো কেন? আমি তো প্রায়ই খাই।

**ভুবন।** মুসলমানের ছোঁয়া খেলে জাত যায়।

বিলে। কেন, জাত যাবে কেন? সন্দেশ তো একই দোকানের তৈরী। তবে হিন্দুর ছোঁয়াতে জাত যায় না—মুসলমানে ছুঁলে জাত যায়? তা কেন হবে?

ভুবন। হ্যাঁ, তাই হয়।

বিলে। মুসলমানও মানুষ, আমরাও মানুষ।

ভুবন। ফের মুখের উপর তর্ক? উকিলের ছেলে এখন থেকেই উকিল হয়ে উঠচে। যেমন বাপের জাত বিচার নেই—তেমনি ছেলেও হয়ে উঠেছে ম্লেচ্ছ। ঘেন্নায় মরে যাই। জাত-জন্ম কিছুই আর রইলো না। ছুঁসনে-ছুঁসনে আমায় হতভাগা!

( রাগে গরগর করিতে করিতে প্রস্থান )

বিলে। ওঃ বাবা! একটুখানি ছোঁয়াতেই জাতটা চলে যায়? এতো তা হলে ভারি ঠুন্‌কো জিনিস? ( নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া ) নবীনদা, ও নবীনদা!

( নেপথ্যে )

নবীন। কি বিলু ভাই

( নবীণের প্রবেশ )

বিলে। বলি যাচ্ছো কোথায়? এদিকে এসো, ভয়ানক দরকার।

নবীন। বলো কি দরকার? দেরী হলে মা বকাবকি করবেন।

বিলে। মা বকবে? তাতে কি? মা তো সবাইকেই বকে। এইতো আমায় কত বকে গেল।

নবীন। বলো তোমার কি দরকার।

বিলে। আচ্ছা নবীনদা, জাতটা কি ?

নবীন। জাতটা ? ( ভাবিয়া ) জাতটা, জাত আর কি।

বিলে। কিন্তু সেটা কি ?

নবীন। কেন ? এই যেমন ধরো, হিন্দু, মোছলমান, খিষ্টেন এই আর কি ?

বিলে। মুসলমানের ছোঁয়া খেলে জাত যায় ?

নবীন। ওঃ বাবা। যায় না ? একেবারেই যায়।

বিলে। কেন ?

নবীন। তা জানি না—তবে যায়।

বিলে। জানো না তবে মানো কেন ?

নবীন। মানবো না ? এরা যে সব আলাদা।

বিলে। এরা আলাদা কেন ?

নবীন। এটা আর জানো না ভাই ? এরা কেষ্ট পূজা করে, ওরা খেষ্ট পূজা করে—তারা করে আল্লার নামাজ।

বিলে। সে তো সবই একই ভগবানের নাম।

নবীন। হুঁ হুঁ, কি যে বলো ভাই ! এরা সবাই আলাদা ! আমাদের কেষ্ট—মাথায় চুড়ো, হাতে বাঁশী, কি সুন্দর দেখতে ! আর খেষ্ট—একমুখ দাড়ি, নেংটি পরা, এক তেকেঠেতে ঝুলানো। আর আল্লার নাকি কোন রূপই নেই। তা আর আলাদা হবে না ?

বিলে। আচ্ছা, এরা সব মরলে কি হয় ?

নবীন। মরলে সবই মাটি হযে যায়। তুমি আমার দেরী করে দিলে। যাই, বাবুর আসার সময় হয়ে গেছে।

( প্রস্থান )

বিলে। ভারি মজা তো ! এখানেও এক রকম—মরেও হয়ে যায় এক রকম !

তবে কেন এই জাতের তফাৎ? দেখবো এখুনি যাচাই করে কোন জাতের কি আস্বাদ।

(পাশের তাকের উপর সাজাইয়া রাখা হুঁকার সারির কাছে সরিয়া আসিয়া)

এটা খৃষ্টান, এটা মুসলমান! বাঃ বাঃ, হিন্দুর ভিতর আবার দুটো জাত—কায়স্থ আর বামুন। দেখা যাক এবার কোনটার কি স্বাদ।

(পরপর সব কটাকেই একবার টানিয়া)

থুঃ থুঃ থুঃ। সব কটার গন্ধই এক রকম—কোনটারই কোন আস্বাদ নেই। সব কটাই তো একই রকম ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ করে! তবে কেন এটার গায়ে লাল সুতো, এটার গায়ে শাদা? এটার গলায় কড়ি বাঁধা? দেখি আবার টেনে। (আবার হুঁকা টানিতে লাগিল)

(বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্বনাথ। কিরে বিলে, এখানে একলা করছিস কি? ওকি, লুকিয়ে তুই তামাক খাচ্ছিস নাকি?

বিলে। না, জাত চেখে দেখছি! এটা খৃষ্টান, এটা মুসলমান, এটা কায়স্থ—এটা বামুন। কোনটার কি আস্বাদ তাই দেখছি।

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) কেন রে? তাতে কি হবে? এ খেয়াল তোর মাথায় কে দিলে? আর এতো ভাবছিস্ কি?

বিলে। ভাবছি, চিহ্ন বদলে সবগুলোকেই এক চিহ্ন করে দিলে কেমন হয়। আর সব জাতগুলোকেই কি করে এক জাত করা যায়।

বিশ্বনাথ। (গাঢ়স্বরে) কাজটা বড়ই শক্তরে বিলে! তুই কি পারবি? যদি পারিস, দে সব ভেঙ্গে।

বিলে। বাবা, জগতে কি এমন কিছুই নেই যাতে এই জাতটাত সব উঠে যায়?

বিশ্বনাথ। কি জানি বাবা! হয়তো আছে। কিন্তু আমি তার সন্ধান জানি না। তুই দেখিস্ চেষ্টা করে, যদি তার সন্ধান পাস্।

বিলে। হ্যাঁ, তাই দেখতে হবে। একবার যদি তার সন্ধান পাই—তবে সবার আগে ভাঙবো এই জাতের বিচার।

(প্রস্থান)

বিশ্বনাথ। (আত্মগত ভাবে) কাজটা বড়ই শক্তরে বিলে! ~~কচি মাথার পক্ষে ভারটা যে বড়ই গুরু~~। পারবি কি বাবা, তোর ওই কচি হাত দুটো দিয়ে যুগ-যুগান্তরের এই কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে দিতে? ~~(কে জানে, হয় তো তুই পারবি—হয় তো তুই পারবি না বিলে~~। তবুও ~~দেখ যদি পারিস এই বাঁধন খুলে~~ মানুষকে মুক্তি দিতে।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবন। দেখো, তোমার সঙ্গে আজ আমার ভয়ানক ঝগড়া আছে।

বিশ্বনাথ। কিন্তু আমার সঙ্গে কারোই ঝগড়া নেই।

ভুবন। কিন্তু আমার ঝগড়া আছে।

বিশ্বনাথ। বেশ তাহলে তুমি করো, আমি শুনি।

ভুবন। বলি, ও রকম চোখ বুজে থাকলে, সংসার আর কতদিন চলবে?

বিশ্বনাথ। কেন? বেশই তো চলছে। আমি খুব সুখেই আছি। আমার এ সুখের সংসার।

ভুবন। (মুখ ঘুরাইয়া) হ্যাঁ, সুখের সংসার! বলি, তোমার চোখে কি কিছু পড়ে?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, পড়বে না কেন? খুবই পড়ে। সবার আগে নজর পড়ে মক্কেলের উপর। তারপর—ক্লাব, পার্টি, ফিস্ট কোথায় কি হচ্ছে তার উপর। আর ঘরে ঢুকলেই নজর পড়ে তোমার উপর।

ভুবন। (হাসি মুখ ঝামটা দিয়া) ছাই পড়ে! বলি, সংসারে কোথায় কি হচ্ছে—তা একটু দেখতে হয়?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, তা দেখি তো! আমার যে চারটে চোখ আছে। এই দুটো দিয়ে দেখি বাইরের সব—আর ওই দুটো দিয়ে দেখি ভিতরের সব।

ভুবন। (হাসিয়া) তবে তো সব কর্তব্যই শেষ হয়ে গেল। না না, বিলেকে নিয়ে আমি বড়ই চিন্তায় আছি। এমন দুর্দান্ত হয়েছে ছেলেটা, আর এমনি অদ্ভুত তার সব ক্রিয়াকলাপ যে, আমি আর সামলাতে পারছি না তাকে।

বিশ্বনাথ। কেন, তুমি তো বেশ তদারক করছো তার।

ভুবন। না না। বাপ যদি একেবারেই কিছু না বলে, তবে মায়ের কাছে ঠিক শিক্ষা হয় না ছেলের।

বিশ্বনাথ। কেন হবে না? মায়ের কাছেই তো ছেলের শিক্ষা হয় সব চেয়ে ভাল। আর তুমি তো উপযুক্ত মা ভুবন! আমিও তো মায়ের কাছেই মানুষ। আমি কি উপযুক্ত হইনি? তবে বিলেই বা তোমার কাছে মানুষ হবে না কেন?

ভুবন। না, তবুও তোমার একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। পাঠশালার পড়া তার শেষ হয়ে গেছে। ছেলেটার ধারও খুব—কিন্তু খালি দুরন্তপনা করে বেড়াবে। ওকে এখন বড় স্কুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি—একটু শাসন করে দাও। কিন্তু দেখো, যেন বেশী বকাবকি করো না।

(প্রস্থান)

বিশ্বনাথ। (হাসিয়া) ছেলেকে উপদেশ দিতে হবে, শাসন করতে হবে—কিন্তু বেশী বকাবকি করা চলবে না। ~~ভুবনের ছেলে অন্তপ্রাণ~~! অদ্ভুত জিনিস এই মাতৃস্নেহ।

( বিলের প্রবেশ )

বিলে। আমায় ডেকেছো বাবা ?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁরে, শোন ! মাস্টারের কাছে গান শিখছিস তো ?

বিলে। হ্যাঁ।

বিশ্বনাথ। পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেছে ?

বিলে। হ্যাঁ, সে কবে শেষ হয়ে গেছে।

বিশ্বনাথ। এবার তোকে বড় স্কুলে ভর্তি করে দেবো। তোকে ইংরাজী শিখতে হবে।

বিলে। না, আমি ইংরাজী পড়বো না।

বিশ্বনাথ। সে কি ! তোকে যে বিলেত যেতে হবে—ব্যারিস্টার হতে হবে। ইংরাজী না শিখলে তা হবে কি করে ?

বিলে। না, আমি বিলাতও যাবো না, ব্যারিস্টারও হবো না। আমি শিখবো আমার দেশের ভাষা।

বিশ্বনাথ। কিন্তু অন্য দেশের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলে তবেই বুঝতে পারা যায় নিজের দেশের জ্ঞানের প্রকৃত মর্যাদা।

বিলে। তাই নাকি ? ( ভাবিয়া ) আচ্ছা বাবা, তবে আমি ইংরাজী পড়বো।

( প্রস্থান )

বিশ্বনাথ। ( আত্মগত ভাবে ) বিদেশী শিক্ষায় এই বিদ্বেষ ! কে জানে, হয়তো এই ভাষাতেই বাজাবে তোর বিজয় ডঙ্কা। এই ভাষাতেই একদিন তুই করবি বিশ্বজয়। কে জানে, কালস্রোতে কি এর ভবিষ্যত ! কে জানে বিলে, কোন পথে তোকে নিয়ে যাবেন তোর ভাগ্য দেবতা ! আমি আশীর্বাদ করি—যে বহ্নি জ্বলে তোর বুকে, তা যেন অকালে নিভে না যায়। তুই মানুষ হোস—তুই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দিস।